Rokomari.com
বাংলাদেশ রাজনীতির
৫০ বছর
ড. তারেক শামসুর ...
210709#
209064#555318-2
9"789849" 43176 "

বাংলাদেশ রাজনীতির ৫০ বছর

তারেক শামসুর রেহমান সম্পাদিত

বাংলাদেশ রাজনীতির ৫০ বছর

তারেক শামসুর রেহমান
সম্পাদিত

বাংলাদেশ রাজনীতির ৫০ বছর

বাংলাদেশ পঞ্চাশ বছরে পা দিয়েছে। একটি রাষ্ট্রের জন্য পঞ্চাশ বছর আশাব্যঞ্জক। এই পঞ্চাশ বছরে বাংলাদেশের অগ্রগতি একেবারে কম নয়। বাংলাদেশ রাজনীতির পঞ্চাশ বছর গ্রন্থে আমরা বাংলাদেশের পঞ্চাশ বছরের ইতিহাসে বিভিন্ন ক্ষেত্রে যেসব অগ্রগতি হয়েছে, সে ব্যাপারে আলোকপাত করেছি। রাজনীতি, অর্থনীতি, উন্নয়ন, বাণিজ্য, কৃষি, নারী, বৈদেশিক নীতি, সংসদীয় রাজনীতি প্রতিটি ক্ষেত্রে যেসব অগ্রগতি হয়েছে তার চুলচেরা বিশ্লেষণ করা হয়েছে। প্রতিটি প্রবন্ধ বাংলাদেশের ৫০ বছরের অগ্রগতির আলোকে রচিত হয়েছে। এটি মূলত একটি সংকলিত গ্রন্থ এবং বাংলাদেশের শীর্ষস্থানীয় একাডেমিশিয়ানরা প্রবন্ধগুলো লিখেছেন এবং বিশ্লেষণ করেছেন। কোথাও কোথাও ভবিষ্যৎ রূপরেখাও তাঁরা তুলে ধরেছেন। সামগ্রিক বিচারে গ্রন্থটিতে বাংলাদেশের পঞ্চাশ বছরের একটি পূর্ণাঙ্গ চিত্র পাওয়া যাবে। এটি একটি একাডেমিক গ্রন্থও বটে। যাঁরা বাংলাদেশের রাজনীতি, অর্থনীতি তথা সমাজনীতি নিয়ে ভাবেন, তাঁদের চিন্তার খোরাক জোগাবে এই গ্রন্থটি। রেফারেন্স গ্রন্থ হিসেবেও এটি গবেষকদের অনেক সাহায্য করবে। প্রবন্ধগুলো পাঠ করে বিগত পঞ্চাশ বছরে বাংলাদেশের অগ্রগতি সম্পর্কে যেমনি একটি ধারণা পাওয়া যাবে, ঠিক তেমনি বাংলাদেশের আগামী দিনগুলো কোনদিকে যাবে, সে সম্পর্কেও একটি ধারণা পেতে আমাদের সাহায্য করবে। গ্রন্থটি পাঠ করে শিক্ষা, রাজনীতি ও নীতি প্রণয়নের সাথে যাঁরা জড়িত, তাঁরা সবাই উপকৃত হবেন।

প্রচ্ছদ : ধ্রুব এষ

বাংলাদেশ রাজনীতির ৫০ বছর

তারেক শামসুর রেহমান
সম্পাদিত

শোভা প্রকাশ ॥ ঢাকা

প্রকাশকাল
প্রথম প্রকাশ : ফেব্রুয়ারি ২০২১

প্রকাশক
মোহাম্মদ মিজানুর রহমান
শোভা প্রকাশ
৩৮/৪ বাংলাবাজার মান্নান মার্কেট
তৃতীয় তলা ঢাকা-১১০০

স্বত্ব
প্রকাশক

বর্ণবিন্যাস
এ্যাপেলটক কম্পিউটার

প্রচ্ছদ
ধ্রুব এষ

মুদ্রণ
একতা প্রেস এন্ড পাবলিকেশন্স

দাম
৬৭৫ টাকা

ISBN : 978 984 94731 7 6

Bangladesh Rajnitir 50 Bochor Edited by Tareque Shamsur Rehman. Published by Mohammad Mizanur Rahman, Shova Prokash, 38/4 Banglabazar, Mannan Market, Dhaka-1100.

Price : 675.00 BDT

ঘরে বসে শোভা প্রকাশ এর সকল বই কিনতে ভিজিট করুন
http:// rokomari.com/shovaprokash
ফোনে অর্ডার করতে ০১৫ ১৯৫২ ১৯৭১ হট লাইন ১৬২৯৭।

উ ৎ স র্গ

একাত্তরের মহান মুক্তিযুদ্ধে
যাঁরা শহীদ হয়েছেন
তাঁদের প্রতি শ্রদ্ধা

সূচিপত্র

সম্পাদকীয় ॥ ১১-১৯

প্রথম অধ্যায় ॥ ২১-১৪৬

আলী রীয়াজ
বাংলাদেশে গণতন্ত্রের সংকট ধর্মের প্রভাব বৃদ্ধি ও বিকাশমান মধ্যবিত্ত ॥ ২১

মোঃ নজরুল ইসলাম
পলিটিক্যাল ইসলাম : বাংলাদেশে ইসলাম ও রাজনীতি ॥ ৫১

সাঈদ ইফতেখার আহমেদ
সেক্যুলার গণতন্ত্র ও প্রেক্ষিত বাংলাদেশ ॥ ১০১

মু. মনিরুজ্জামান
বাংলাদেশে দলীয় রাজনীতি ও রাজনৈতিক সহিংসতার ৫০ বছর : প্রবণতা এবং কাঠামোর একটি বিশ্লেষণ ॥ ১১৩

মো. এনায়েত উল্ল্যা পাটওয়ারী
স্বাধীনতার ৫০ বছর : প্রত্যাশা ও প্রাপ্তি ॥ ১৪১

দ্বিতীয় অধ্যায় ॥ ১৪৭-২৯৬

মইনুল ইসলাম
বাংলাদেশে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি এবং ক্রমবর্ধমান আয়বৈষম্য ॥ ১৪৭

কাজী সাহাবউদ্দিন
পাঁচ দশকের কৃষি ও খাদ্যনীতির পর্যালোচনা ॥ ১৮৮

শামসুল আলম
যুদ্ধবিধ্বস্ত-দুর্ভিক্ষপীড়িত দেশ থেকে স্বনির্ভর কৃষি ॥ ২০১

মোস্তফা আবিদ খান
বাণিজ্যের অগ্রযাত্রায় বাংলাদেশের ৫০ বছর ॥ ২১২

আর এম দেবনাথ
পাঁচ দশকের অর্থনীতির গতি ও প্রকৃতি ॥ ২৩৭

ফয়েজ আহমদ তৈয়্যব
স্বাধীনোত্তর বাংলাদেশের অর্থনৈতিক ধারা ও দারিদ্র্য বিমোচন ॥ ২৪৬

মারুফ মল্লিক
স্বাধীনতার ৫০ বছর : উন্নয়ন দর্শন ও বৈষম্য ॥ ২৮১

তৃতীয় অধ্যায় ॥ ২৯৭-৪০৪

অরুণ কুমার গোস্বামী
স্বাধীনোত্তর আওয়ামী লীগের ৫০ বছর ॥ ২৯৭
ফেরদৌস আহমদ ভূইয়া
চার দশক পেরিয়ে বিএনপি : একাল সেকাল ॥ ৩২৫
মোসা. কামরুন নাহার
বাংলাদেশের গণতন্ত্র চর্চায় রাজনৈতিক দলের ভূমিকা ॥ ৩৩৭
তাসলিমা আক্তার
জোট রাজনীতি : প্রেক্ষিত বাংলাদেশ ॥ ৩৫৯
সাখাওয়াত মজুমদার
বাংলাদেশের রাজনৈতিক দলসমূহের উদ্ভব ও বিকাশ ॥ ৩৮৯

চতুর্থ অধ্যায় ॥ ৪০৫-৪৯০

কে. এম. মহিউদ্দিন
জাতীয় সংসদে আইন প্রণয়নমূলক কার্যক্রম ॥ ৪০৫
মো. সুলতান মাহমুদ
স্বাধীনতা-পরবর্তী ৫০ বছরে বাংলাদেশে দলীয় রাজনীতির প্রকৃতি ও প্রবণতা ॥ ৪৩৫
ফাহমিদা আক্তার
জাতীয় সংসদ নির্বাচন, ১৯৭৩-২০১৮ ॥ ৪৫৩
মোহাম্মদ আলী
বাংলাদেশের সাংবিধানিক বিবর্তন ॥ ৪৭৯

পঞ্চম অধ্যায় ॥ ৪৯১-৫৬৮

ইকতেদার আহমেদ
বিচার বিভাগের স্বাধীনতা ৭২'র সংবিধান হতে কত দূরে? ॥ ৪৯১
রাশেদা আখতার
নারী ও রাজনীতি : বাংলাদেশ প্রেক্ষিত ॥ ৪৯৭
শাওয়াল খান
সিডও দিবস ও বাংলাদেশে নারীর সমানাধিকার ॥ ৫১৫
দিলারা রহমান ও মোঃ আসিরুল হক
সিভিল সোসাইটি ও বাংলাদেশ ॥ ৫১৯
আবদুল লতিফ মণ্ডল
বাংলাদেশের প্রশাসন ব্যবস্থায় সংস্কার ও পরিবর্তনের রাজনীতি ॥ ৫৪১
মুহাম্মদ আজাদ খান
বাংলাদেশের স্থানীয় সরকারের বিবর্তন ॥ ৫৪৮

ষষ্ঠ অধ্যায় ॥ ৫৬৯-৬৪৬

তারেক শামসুর রেহমান
বাংলাদেশের বৈদেশিক সম্পর্ক, ১৯৭২-২০২০ ॥ ৫৬৯
এম. সাখাওয়াত হোসেন
রোহিঙ্গা ইস্যু আঞ্চলিক অস্থিরতার ঝুঁকি বাড়াচ্ছে ॥ ৬১৩
মো. হারিছ উদ্দিন
রোহিঙ্গা সংকট, ভূরাজনীতি ও বাংলাদেশের নিরাপত্তা ॥ ৬১৭

সপ্তম অধ্যায় ॥ ৬৪৭-৬৬৬

মো. জাকির হোসেন
পার্বত্য শান্তিচুক্তির ২৩ বছর ॥ ৬৪৭
সৈয়দ ইবনে রহমত
পার্বত্য শান্তিচুক্তি ও প্রাসঙ্গিক কিছু কথা ॥ ৬৫৩

লেখক পরিচিতি ॥ ৬৬৭-৬৭০

ব্যবহার করা হয়েছে। হেজিমনি সংক্রান্ত বিস্তারিত ধারণার জন্য দেখুন: K. J. Holsti, The Dividing Discipline, Hegemony and Diversity in International Theory, (UK: Harper Collins Publishers Ltd; 1985).

৮. Partha Chatterjee, Empire and Nation, (New York: Columbia University Press, 2001), p. 42.

৯. দেখুন Mishra, পূর্বোক্ত p. ১৪৭.

১০. প্রবন্ধের লেখক বিভিন্ন সময় বিভিন্ন বাম রাজনৈতিক দলের কর্মী এবং জেলা পর্যায়ের নেতাদের এ প্রত্যয়গুলোর অর্থ জিজ্ঞাসা করলে কেউই লেখককে এর প্রত্যয়সমূহের অর্থ বলতে পারেননি।

১১. এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, রাষ্ট্রধর্ম ইসলাম ঘোষণা করা হলেও পাকিস্তান ও বাংলাদেশে এর দ্বারা যারা শুধু সুন্নি ইসলামের বিভিন্ন ধারার অনুসারী শুধু তাদের স্বার্থ ও পরিচয় রাষ্ট্র বহন করবে এটি প্রচ্ছন্নভাবে বিধৃত হয়েছে। ফলে পাকিস্তানি জনগোষ্ঠীর প্রায় ২০ শতাংশ শিয়া ইসলামের অনুসারীরা নিজেদের রাষ্ট্রব্যবস্থা থেকে বিযুক্তই ভেবে আসছে। বিভিন্ন সময় তারা নানা সুন্নি সংগঠন কর্তৃক নিপীড়ন ও বৈষম্যের শিকার হলেও রাষ্ট্রকে তাদের স্বার্থ সংরক্ষণে তেমন কার্যকর পদক্ষেপ নিতে দেখা যায়নি। একই সঙ্গে পাকিস্তান রাষ্ট্র আহমদিয়া জামাত (প্রচলিত ভাষায় কাদিয়ানি) এবং যারা ইসলাম ধর্ম অনুসরণ করেন না তাঁদের সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও ধর্মীয় অধিকার রক্ষায় কখনো অপারগ এবং কখনো ব্যর্থ হয়েছে। বাংলাদেশেও কমবেশি আমরা একই চিত্র প্রত্যক্ষ করেছি।

মু. মনিরুজ্জামান

বাংলাদেশে দলীয় রাজনীতি ও রাজনৈতিক সহিংসতার ৫০ বছর : প্রবণতা এবং কাঠামোর একটি বিশ্লেষণ

ভূমিকা

বাংলাদেশ স্বাধীন জাতিরাষ্ট্র হিসাবে পঞ্চাশ বছরে পা দিয়েছে। বাংলাদেশের স্বাধীনতা রাজনৈতিক ক্ষমতার বৈধ অধিকারের দাবি দ্বারা উৎসাহিত হয়েছিল যা ফেডারেল পশ্চিম পাকিস্তানি সরকার অস্বীকার করেছিল। বহুদলীয় এবং গণতান্ত্রিকভাবে উদার দেশ হিসাবে আকাঙ্ক্ষিত হলেও বিভিন্ন শ্রেণির স্বৈরতন্ত্র এবং গণতন্ত্রের মধ্যে দেশে অশান্ত রাজনৈতিক অতীত দেখা গিয়েছে বারবার। বাংলাদেশের পঞ্চাশ বছরের রাজনীতি ব্যক্তি শাসন, একদলীয় রাজনীতি ও শাসন, বহুদলীয় রাজনীতি, জোটের শাসন, একদলীয় প্রভাবশালী শাসন, সামরিক শাসন, নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক শাসন এবং রাষ্ট্রপতি ও সংসদীয় ব্যবস্থার সাক্ষী হয়ে রয়েছে। স্বাধীনতার পর দুই দশকের নানাবিধ চড়াই-উতরাই পেরিয়ে অবশেষে ১৯৯১ সালে বাংলাদেশ বহুদলীয় সংসদীয় গণতন্ত্রের স্থিতিশীল পর্যায় লাভ করে। পরের দুই দশকে দলীয় রাজনীতি প্রাণচঞ্চল ও প্রাতিষ্ঠানিকভাবে অব্যাহত থাকে, তবে এর পরের দশকে রাতারাতি এই পথ থেকে লাইনচ্যুত হয়।

গণতান্ত্রিক জোয়ারের সময়ে দলগুলো স্বাধীনভাবে নিজেদের প্রকাশ করেছিল। বর্তমানে বাংলাদেশে চল্লিশটিরও বেশি সংখ্যক নিবন্ধিত রাজনৈতিক দল রয়েছে। রাজনৈতিক দলসমূহ সাধারণত উচ্চ প্রতিযোগিতামূলক, দলীয় এবং কখনো কখনো আদর্শগতভাবে গভীরভাবে বিভক্ত থাকে। অনেক সময় দলগুলো জোট গঠনের দিকে পরিচালিত অভিন্ন স্বার্থে সহযোগী হয়ে ওঠে, তবে কখনো আবার তারা আন্তঃদলীয় সহিংসতা ও রাজনৈতিক অচলাবস্থার পক্ষে একে অপরের তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বী হয়ে ওঠে। বিগত পঞ্চাশ বছরে অসম রাজনৈতিক বিকাশ, রাজনৈতিক সহিংসতার সাথে অত্যন্ত বৈশিষ্ট্যযুক্ত ছিল। ১৯৯১ সাল থেকে তা এতটাই স্পষ্ট হয়ে ওঠে যে, সহিংসতা প্রাতিষ্ঠানিক রাজনৈতিক

সংস্কৃতিতে পরিণত হয়। এই জাতীয় রাজনৈতিক সংস্কৃতি, রাজনৈতিক সহিংসতার কারণ মূল্যায়নের জন্য এবং এর কাঠামো বিশ্লেষণের প্রয়োজন এখন সময়ের দাবি।

রাজনৈতিক দলভেদে প্রতিটি দলীয় ব্যবস্থায় দলগুলো আদর্শগতভাবে এবং নীতিগত বিষয়গুলোতে একে অপরের থেকে আলাদা। তবে আদর্শিক রাজনৈতিক পার্থক্যগুলো সংসদীয় বয়কট বা ওয়াকআউটের মতো আনুষ্ঠানিক এবং প্রাতিষ্ঠানিক উপায়ে প্রকাশ পায়। দক্ষিণ কোরিয়া এবং তাইওয়ানের মতো সংসদে এমন উদাহরণ রয়েছে যেখানে ক্ষমতাসীন এবং বিরোধী দলগুলোর মধ্যকার রাজনৈতিক পার্থক্য শারীরিক সহিংসতার কারণ হয়ে দাঁড়ায়। তবে এই দেশগুলোতে রাজনৈতিক পার্থক্য বা সংসদে শারীরিক সহিংসতা দলীয় সমর্থক এবং প্রতিদ্বন্দ্বীদের মধ্যে রাস্তায় সহিংসতার কারণ হয় না। বাংলাদেশের ক্ষেত্রে রাজনৈতিক মতপার্থক্য বেশির ভাগ ক্ষেত্রে রাজনৈতিক প্রতিদ্বন্দ্বীদের মধ্যে রাস্তায় সহিংসতায় আকারে ছড়িয়ে পড়ে। এটি কেবল প্রতিদ্বন্দ্বী দলগুলোর মধ্যেই নয়, মিত্র দলগুলোর ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। সুতরাং, দলীয় রাজনৈতিক বিরোধ বাংলাদেশে একটি স্বতন্ত্র অর্থ ধরে নিয়েছে যাকে বলা যায়- হিংস্রতা।

আমরা প্রথমে দলীয় রাজনীতির প্রকৃতি, রাজনৈতিক সহিংসতা এবং বাংলাদেশে সহিংস-রাজনীতির পরিণতি সম্পর্কে বিশ্লেষণমূলক আলোকপাত করবো। প্রথমত, সহিংসতা বাংলাদেশে একটি সক্রিয় এবং নেতিবাচক রাজনৈতিক সংস্কৃতিতে পরিণত হয়েছে। দ্বিতীয়ত, ক্ষমতা দাবি করা এবং ধরে রাখার কৌশল হিসাবে সহিংসতাকে গণ্য করা হয়। তৃতীয়ত, সহিংসতা ব্যক্তিগত রাজনৈতিক চিত্রকে প্রশস্ত করে তোলে। চতুর্থ, আন্তঃদলীয় রাজনৈতিক সহিংসতা এবং শত্রুতা একে অপরকে শক্তিশালী করে, যার ফলে সহিংসতার সংস্কৃতি দৃঢ় হয়। শেষ অবধি, অনুভূমিক স্তরে আন্তঃদলীয় সহিংসতা ক্ষমতাসীন দল এবং বিরোধীদের মধ্যে উল্লম্ব স্তরে রাজনৈতিক অসহযোগ এবং অচলাবস্থার দিকে পরিচালিত করে।

বাংলাদেশে দলীয় রাজনীতির ৫০ বছর

রাজনৈতিক দলসমূহ বাংলাদেশের সর্বাধিক সক্রিয় রাজনৈতিক এজেন্ট হিসাবে কাজ করে। ১৯৪৮-১৯৭১ এর দশকে বিশ বছরেরও বেশি সময় ধরে এই অঞ্চলে সহিংসতা ছড়িয়ে পড়েছিল। বাংলাদেশের রাজনৈতিক দলগুলোর গুরুত্বের ঐতিহ্যটি মূলত স্বাধীন "বাংলাদেশ আন্দোলনের" ভেতরে রয়েছে। যদিও বৃহত্তর সমাজ ব্যাপকভাবে সামাজিকীকরণের পরেও গণতন্ত্র এবং রাজনীতির সাথে ছিল, রাজনৈতিক দলগুলো স্বাধীনতা পূর্ব বাংলাদেশে প্রাতিষ্ঠানিকভাবে সক্রিয় ছিল। ১৯৪৭ সালে ব্রিটিশ ভারত বিভাগের পূর্বে পঞ্চাশ

বছরেরও বেশি সময় ধরে বেশ কয়েকটি কমিউনিস্ট পার্টির অস্তিত্ব থাকা সত্ত্বেও বাংলাদেশীরা মূলত সর্বভারতীয় মুসলিম লীগের সাথে পরিচিত ছিল।

জনগণের রাজনৈতিক প্রতিনিধিত্ব করতেন উচ্চবিত্তরা, সাধারণ বা মিডলক্লাসের লোকদের নেতৃত্ব দেওয়ার সুযোগ খুব কম ছিল। দলগুলো এবং নেতারা পরবর্তীকালের দৃষ্টিভঙ্গি এবং চিন্তাধারাকে উপস্থাপন করার ভান করে মানুষের আগ্রহ এবং ভাগ্য স্থির করে। তবে, এই ধারাটি ১৯৫০ ও ১৯৬০-এর দশকে রাজনৈতিক-মতাদর্শে পরিবর্তিত হয়ে গণ-রাজনীতি ও গণ-রাজনৈতিক দলগুলোতে পরিবর্তিত হয় এবং নিখিল-পাক মুসলিম পরিচয় থেকে নৃ-গোষ্ঠীভিত্তিক ধর্মনিরপেক্ষ আওয়ামী লীগে আওয়ামী মুসলিম লীগের অভিমুখীকরণ ঘটে।

মিডলক্লাস থেকে উদ্ভূত রাজনৈতিক নেতৃত্বের নতুন প্রজন্ম বাংলাদেশে ক্রমবর্ধমান ধাঁচে পরিণত হতে শুরু করে। বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার সময়কালীন বিশেষ রাজনৈতিক নেতৃত্ব মূলত মিডলক্লাস থেকেই এসেছিল এবং জনগণের রাজনৈতিক সামাজিকীকরণ মোটামুটি' একটি সাধারণ জায়গায় এসেছিল। ১৯৭১ সালে বাংলাদেশের স্বাধীনতা মূলত বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ এর নেতৃত্বে এসেছিল, যা তৎকালীন রাজনীতিতে যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করেছিল (ভূঁইয়া, ১৯৮২)। পরবর্তী পঞ্চাশ বছরে এখানে রাজনৈতিক দলগুলো বিস্তৃত হয়েছে। ২০২০ সালে নির্বাচন কমিশন ৪৪টি নিবন্ধিত দলের একটি তালিকা প্রকাশ করেছে। তবে ২০০১ সালের সাধারণ নির্বাচনে ৫২টি রাজনৈতিক দল প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছিল। রাজনৈতিক দলগুলোর সংখ্যা বৃদ্ধি, সংবিধানের পর্যায়ক্রমিক স্থগিতাদেশ সত্ত্বেও রাজনৈতিক উদারপন্থার ব্যাপকতা নির্দেশ করে। বর্তমানে বাংলাদেশে প্রধান রাজনৈতিক দলগুলো হলো- বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ, বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল, জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশ এবং জাতীয় পার্টি । যদিও জামায়াত এখন নিষিদ্ধ।

১৯৪৯ সালে প্রতিষ্ঠিত আওয়ামী লীগ ব্যাপকভাবে তৃণমূলের সমর্থন নিশ্চিত করেছে। বিশেষত ১৯৭১ সালের স্বাধীনতা যুদ্ধে নেতৃত্বের ভূমিকার জন্য দলটি জনপ্রিয়। দলটি ১৯৭২-৭৫, ১৯৯৬-২০০০, ২০০৯-(বর্তমান) সময় পর্যন্ত ক্ষমতায়। প্রয়াত সেনা জেনারেল-রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমান ১৯৭৭ সালে বিএনপি প্রতিষ্ঠা করেছিলেন এবং এটি ব্যাপক জনপ্রিয়তা অর্জন করে। এই দলটি ১৯৭৯-৮৩, ১৯৯১-১৯৯৫ এবং ২০০১-২০০৬ সাল সময় পর্যন্ত ক্ষমতায় ছিল। ব্রিটিশ ভারত সময়কাল এবং তারপরে জামায়াতে ইসলামীর পাকিস্তানে জেআইবির ঐতিহাসিক শিকড় রয়েছে। স্বাধীনতার পরে দলটি নিষিদ্ধ করা হলেও ১৯৭০-এর দশকের শেষদিকে এই নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার করা হয় এবং এটি জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশ নামে কাজ শুরু করে। ১৯৮৬ সালের নির্বাচনের পর থেকে দলটি আরো শক্তিশালী হয়ে ওঠে এবং ১৮টি সংসদীয় আসন লাভ করে। ১৯৯১

সালের নির্বাচনে দলটি কিংমেকার ছিল কারণ সরকার গঠনের পক্ষে আওয়ামী লীগ ও বিএনপি কোনো দলেরই যথেষ্ট সংখ্যাগরিষ্ঠতা ছিল না। ২০০১ সালের নির্বাচনে দলটি ক্ষমতাসীন বিএনপির একটি জোটের শরিক হয়েছিল। ২০১৮ সালে নির্বাচন কমিশন দলটির নিবন্ধন বাতিল করে।

সেনা জেনারেল থেকে রাষ্ট্রপতি হয়ে যাওয়া হুসেইন মুহাম্মদ এরশাদ প্রতিষ্ঠা করেছিলেন জাতীয় পার্টি। এটি মূলত বিএনপি থেকে দলত্যাগীদের উপর ভিত্তি করে প্রতিষ্ঠিত হয়। দলটি ১৯৮০-১৯৯০ সাল পর্যন্ত ক্ষমতায় থাকলেও পরবর্তীকালে সমস্ত নির্বাচনের সময় বেশ কয়েকটি আসন লাভ করেছিল। এই চারটি বৃহৎ দল ও তাদের রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি এবং দিক নির্দেশনা ব্যাপকভাবে বিস্তৃত।

আরো কয়েকটি ছোটো ছোটো, ব্যক্তিকেন্দ্রিক দল রয়েছে যা ছোটো পরিসরে কিংবা এই কয়েকটি বড়ো দলের সহযোগিতায় নিয়ে কাজ করে। এগুলো ছাড়াও অনেকগুলো কমিউনিস্ট এবং সমাজতান্ত্রিক দল রয়েছে যা সমাজতান্ত্রিক আদর্শকে গ্রহণ করেছে। তবে, বাস্তবে দেশটি আওয়ামী লীগ ও বিএনপির নেতৃত্বাধীন একটি দ্বি- দলীয় ব্যবস্থা নিয়ে কার্যকরভাবে এগুচ্ছে।

শুরু থেকেই বাংলাদেশের রাজনৈতিক দলগুলো দলীয় স্বার্থকে জনগণ ও জাতির উপরে অগ্রাধিকার দিয়ে 'দলীয় রাজনীতি'র প্রতি প্রবল ঝোঁক ধরে রেখেছে। বাংলাদেশে দলীয় রাজনীতিতে কিছু ট্রেন্ড বা প্রবণতা রয়েছে, যা গত পঞ্চাশ বছরের আলোকে চিহ্নিত করা যেতে পারে। প্রথমত, ১৯৭৫ সালের গোড়ার দিকে বাংলাদেশে কৃষক শ্রমিক আওয়ামী লীগ (বাকশাল) নামে একটি একদলীয় ব্যবস্থা প্রবর্তিত হয়েছিল, যেখানে রাষ্ট্র দলের অভ্যন্তরে কার্যত বিলীন হয়েছিল। স্পষ্টতই দলীয় পরিচয় এবং স্বার্থ জাতীয় সংবিধান এবং মূল জাতীয় প্রতিষ্ঠানগুলোকে মেনে চলার চেয়ে প্রধান্য পেয়েছিল। সমাজতান্ত্রিক আদর্শের দ্বারা দৃঢ়ভাবে প্রভাবিত, দলটি মূলত মতাদর্শ বা আদর্শগতভাবে বহুদলীয় রাজনীতির অস্তিত্বকে অস্বীকার করে একদলীয় শাসনব্যবস্থা প্রবর্তন করেছিল। দ্বিতীয়ত, দলীয় রাজনীতি পরিবার ও ব্যক্তিগত নেতৃত্বের সাথে এতটাই প্রাতিষ্ঠানিক হয়ে উঠেছিল যে বিচ্ছিন্ন নেতৃত্ব এবং দলগুলো (আওয়ামী লীগ, বিএনপি, জাপা এবং সমাজতান্ত্রিক দলগুলো থেকে) দেশে কখনই নিজস্ব নামে ব্যাপক প্রভাব বিস্তার করতে পারেনি। আওয়ামী লীগ, বিএনপি এবং জাপা এই তিনটি দলই সর্বজনীন গণতান্ত্রিক নীতির চেয়ে দলীয় প্রতিষ্ঠাতাদের পরিবার ও ব্যক্তিত্বকে মূল্য দিয়েছে। আওয়ামী লীগের বর্তমান নেতৃত্ব, বিএনপি ও জাপা, রাজনৈতিক প্রতিযোগিতামূলক অর্জনের চেয়ে উত্তরাধিকারসূত্রে এবং একক নেতৃত্ব চার দশক ধরে অপরিবর্তিত আছে। তৃতীয়ত, বাংলাদেশে দলীয় রাজনীতি একটি উচ্চতর ক্লায়েন্টিলিক বা পৃষ্টপোষকতাকারী ঐতিহ্য গড়ে

তুলেছে। প্রধান চারটি দলের (আওয়ামী লীগ, বিএনপি, জামায়াত এবং জাপা) প্রত্যেকেরই গ্রাম এবং নগরভিত্তিক কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের সংযোগের অভ্যন্তরীণ সাংগঠনিক শৃঙ্খলা রয়েছে। সদস্যপদ আনুষ্ঠানিকভাবে ফি-ভিত্তিক, যদিও এটি খুব নামমাত্র, তবে নেতৃত্বের পদ বা পদসমূহের প্রতিটি স্তরের কমিটি বা উপ-কমিটির পদগুলো অত্যন্ত ব্যয়বহুল, কারণ এগুলো গোপনীয়তা, ব্যক্তিগত পক্ষপাত এবং আর্থিক অনুদান দ্বারা নির্ধারিত হয়। যেমন দলের সদস্যরা পদ বা পক্ষে পাওয়ার জন্য তাদের নিজ নিজ নেতাদের চারপাশে একটি ক্লায়েন্টের বৃত্ত তৈরি করে। যদিও দলীয় রাজনীতিতে দলগুলোর মধ্যে এই জাতীয় উল্লম্ব ক্লায়েন্টেলিজম হওয়া খুব সাধারণ বিষয়,তবে বাংলাদেশের রাজনীতিতে অন্যান্য অনুমোদিত দলীয় ফ্রন্টগুলোই এই ব্যবস্থাকে প্রতিষ্ঠা করেছে। দুটি প্রধান রাজনৈতিক দলের অসংখ্য অনুমোদিত ক্লাইনেটালিস্টিক বা অঙ্গসংগঠন রয়েছে। এগুলো হলো সহায়ক সংগঠন যাদের উদ্দেশ্য এবং ক্রিয়াকলাপ মূলধারার দলগুলোর সাথে ওভারল্যাপ হয় না। উদাহরণস্বরূপ, আওয়ামী লীগের দলীয় গঠনতন্ত্রে নিম্নলিখিত অনুমোদিত অঙ্গসংগঠনগুলোকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে- বাংলাদেশ মহিলা আওয়ামী লীগ, বাংলাদেশ কৃষক লীগ, বাংলাদেশ আওয়ামী যুবলীগ, বাংলাদেশ স্বেচ্ছাসেবক লীগ, আওয়ামী আইনজীবী পরিষদ, বাংলাদেশ তাঁতী লীগ, বাংলাদেশ যুব মহিলা লীগ, জাতীয় শ্রমিক লীগ, এবং বাংলাদেশ ছাত্রলীগ। স্বীকৃত অঙ্গসংগঠনগুলো ছাড়াও আনুষ্ঠানিকভাবে দলটিতে আরো অনেক সমিতি অন্তর্ভুক্ত রয়েছে যা কিছু নির্দিষ্ট শিরোনাম যেমন 'লীগ', 'মুক্তিযুদ্ধ' হিসাবে প্রতিষ্ঠিত।

আওয়ামী লীগের মতো বিএনপির নয়টি অনুমোদিত ও দুটি সহায়ক অঙ্গ সংগঠন রয়েছে। আওয়ামী লীগের 'ট্রেডমার্ক' যেমন 'লীগ' 'মুক্তিযুদ্ধ', 'বঙ্গবন্ধু', বা শেখ মুজিব পরিবার রয়েছে, বিএনপির 'ট্রেডমার্ক' তেমনি 'জাতীয়তাবাদী', 'দল' এবং 'জিয়া'র মতো ব্যক্তিত্ব। পেশাদার বা নাগরিক সমাজ সংস্থা যেটি 'জাতীয়তাবাদী', 'দল', এবং 'জিয়া' লেবেল বহন করে, তারা বিএনপির সাথে যুক্ত বা সমর্থক বলে মনে করা হয়। তাদের অনুমোদিত নয়টি অঙ্গসংগঠন হলো বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী মুক্তিযোদ্ধা দল; বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী যুবদল; বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী মহিলা দল; বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী সামাজিক ও সাংস্কৃতিক সংস্থা; বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী কৃষক দল; বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী স্বেচ্ছাসেবক দল; বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী তাঁতি দল; বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী উলামা দল; এবং বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী মৎস্যজীবী দল এবং দুটি সহায়ক সংগঠন হলো বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী ছাত্রদল এবং বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী শ্রমিক দল। আনুষ্ঠানিকভাবে স্বীকৃত এই দল ছাড়াও জিয়া পরিষদের মতো অসংখ্য সুশীল সমাজের সংগঠন রয়েছে যাদের উদ্দেশ্য ও কর্মকাণ্ড বিএনপির মূলধারার দলকে সমর্থন করে ।

সারা বাংলাদেশ জুড়ে চিকিৎসক, আইনজীবী, বিশ্ববিদ্যালয়, কলেজ ও স্কুল শিক্ষক, ব্যবসায়ী, এবং ব্যাংকাররা সব ধরনের পেশাদার সংস্থাগুলো দুটি প্রধান রাজনৈতিক দল- আওয়ামী লীগ ও বিএনপির প্রতি ঝুঁকছেন। এই মূলধারার প্রতিটি দলের, অনুমোদিত ও সহায়ক সংস্থাগুলোতে একটি শ্রেণিবদ্ধ কাঠামো রয়েছে যা কেন্দ্র থেকে গ্রাম স্তরে বিভিন্ন প্রশাসনিক স্তর যেমন: কেন্দ্রীয়, জেলা, নগর কর্পোরেশন, শহর, উপজেলা, ইউনিয়ন, ওয়ার্ড এবং এর মাধ্যমে চলে। প্রতিটি স্তরে দল এবং অঙ্গসংগঠনে কয়েক ডজন নির্বাহী সদস্যের সমন্বয়ে কেন্দ্রীয় এবং উপকমিটি রয়েছে। কমিটি এবং উপকমিটির পদের জন্য প্রতিযোগিতা বেশ তীব্র হয়, তবে প্রায়শই কমিটি গঠন না হলে বছরের পর বছর ধরে তা বিলম্বিত হয়। একটি একক পদের একাধিক দাবিদার থাকলে কমিটিগুলোকে প্রায়শই নানাভাবে আপস করতে হয়। ক্ষমতার প্রতিযোগিতায় নানা সমঝোতায় তা শেষ হয়। অনেক সময় কমিটিগুলো অভ্যন্তরীণ বিরোধের কারণে গঠিত হয় না এবং সংগঠনগুলো অ্যাডহক কমিটির ভিত্তিতে পরিচালিত হয়। তদুপরি, অনেক ক্ষেত্রেই অসন্তুষ্ট এবং "বঞ্চিত" সদস্যরা সমান্তরাল দলীয় প্রশাসন এবং দ্বৈত বা একাধিক নেতৃত্বের চ্যানেল তৈরি করে প্রতিদ্বন্দ্বী কমিটি গঠন করে (মনিরুজ্জামান, ২০১৮)।

জাতীয় পার্টি ক্লিনটেলিজমের সামাজিকীকরণ ও প্রাতিষ্ঠানিকীকরণ ১৯৯০ সাল থেকে দেশব্যাপী প্রতিটি স্তরে অত্যন্ত ম্যাচুরেটর হয়ে উঠেছে। এরাই সরকারের রাজনৈতিক শক্তি। ক্ষমতাসীনরা সর্বদা শুরু থেকেই সামাজিকভাবে প্রতিষ্ঠিত হয় না তবে বেশির ভাগ ক্ষেত্রে সিস্টেমে প্রবেশের পরে তাদের পাওয়ার বেজ তৈরি এবং প্রসারিত করে। আমাদের এখানে দেখা যায়, স্থানীয় রাজনৈতিক নেতার সাথে ঘনিষ্ঠ যেগাযোগের কারণে একটি দরিদ্র পরিবার থেকে পড়া ছেড়ে আসা ছাত্রটি হঠাৎ করেই গুরুত্বপূর্ণ একজন অভিজাত ব্যক্তি হয়ে উঠতে পারেন। মূলধারার দলগুলো তৃণমূলের সমর্থন-ভিত্তি এবং তাদের রাজনৈতিক কার্যকলাপের জন্য সহযোগী সংগঠনের বিভিন্ন স্তরের উপর নির্ভর করে। এই সহযোগী সংগঠনগুলোর মূল শক্তি দলগুলো কাজে লাগায় (জ্যাকম্যান, ২০১৯)।

স্বাধীনতা-পূর্ব বাংলাদেশের বেশির ভাগ রাজনৈতিক দল দলীয় বিরোধের ঝুঁকিতে ছিল (রেহমান, ১৯৯৯)। আওয়ামী লীগ, বিএনপি ও জাপা শক্তিশালী দলীয় গোষ্ঠী দ্বন্দ্বের অভিজ্ঞতা অর্জন করেছে, যার ফলস্বরূপ বিচ্ছিন্নভাবে দলগুলো বিভক্ত হয়ে পড়েছিল। এর আগে আওয়ামী লীগের শীর্ষ নেতারা যেমন কাদের সিদ্দিকী কৃষক শ্রমিক জনতা লীগ গঠন করেছিলেন এবং কামাল হোসেন গণফোরাম গঠন করেছিলেন। ওবায়দুর রহমান নামে বিএনপির সেক্রেটারি জেনারেল একটি দল বিএনপি (ওবায়েদ) গঠন করেছিলেন, বদরুদ্দোজা চৌধুরী বিকল্পধারা গঠন করেছেন, এবং শীর্ষ নেতা নাজমুল হুদা বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী ফ্রন্ট (বিএনএফ) গঠন করেছেন। পরে এরশাদের জাতীয় পার্টি

তাঁর শীর্ষ নেতা আনোয়ার হোসেন মঞ্জু জেপি নামে আলাদা দল গঠন করেছেন। যদিও জামায়াত এ জাতীয় দলাদলি দেখেনি, তবে এর অন্যতম প্রবীণ নেতা আবদুর রহিম সত্তরের দশকের শেষদিকে একবার ইসলামিক ডেমোক্রেটিক লীগ (আইডিএল) গঠন করেছিলেন। সম্প্রতি ২০১৯ সালে এর ভিন্নমত পোষণকারী কয়েকজন নেতা নতুন একটি দলও তৈরি করেছেন।

বাংলাদেশে দলীয় রাজনীতি মূলত একটি দ্বিদলীয় ব্যবস্থার জন্ম দিয়েছে যেখানে আওয়ামী লীগ এবং বিএনপি প্রধান প্রতিদ্বন্দ্বিতাকারী হিসাবে রয়ে গেছে। যদিও এই দুটি বৃহত্তম দল, আরোও কিছু ছোট ছোট দলগুলোকে কাছে নিয়ে একটি নির্বাচনী ঐক্য গড়ে তুলেছিল। ১৯৯০ এর দশকের শেষদিকে এরশাদ বিরোধী আন্দোলনে এই ঐতিহ্যটি অনুকরণ করা হয়েছিল। এরশাদ বিরোধী গণতান্ত্রিক আন্দোলনের সময়, সমস্ত রাজনৈতিক দল দুটি বৃহত্তর জোটের অধীনে আসে, একটি ১৪ দলের জোট (আওয়ামী লীগ নেতৃত্বাধীন) এবং অপরটি ১৫টি দলের জোট (বিএনপির নেতৃত্বে)। ১৯৯০ সাল থেকে আওয়ামী লীগ ও বিএনপি উভয়ই জোটের ব্যানারে নির্বাচন লড়েছিল।

দলীয় রাজনীতি এবং রাজনৈতিক সহিংসতা : ৫০ বছরের প্রবণতা

বাংলাদেশে দলীয়-ব্যবস্থার একটি প্রভাবশালী দিক হলো হিংসার সংস্কৃতি। রাজনৈতিক দলগুলো রাস্তায় সহিংসতায় প্রায়শই একে অপরের মুখোমুখি হওয়া একটি সাধারণ বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে। হিংস্রতার এ জাতীয় সংস্কৃতি কখন থেকে বাংলাদেশের রাজনীতির একটি বড়ো ফ্যাক্টর হয়ে উঠেছে, তা সঠিকভাবে বলা মুশকিল।

বিরোধীদের বিরুদ্ধে লড়াই করতে এবং রাজনীতি নিয়ন্ত্রণে নিতে বিভিন্ন রাজনৈতিক দল তার ছাত্র সংগঠনে অস্ত্র বিতরণ করে এবং এর ফলে অস্ত্র সংস্কৃতি আরো প্রাতিষ্ঠানিক হয়ে ওঠে। ১৯৮০ এর দশকের শেষের দিকে, মূলধারার রাজনৈতিক দলগুলোর ছাত্রসংগঠনসমূহের মধ্যে ঘনঘন সংঘর্ষের ঘটনা এরই প্রতিধ্বনিত করে (হুসেন, ২০০২)।

আজ বেশিরভাগ বড়ো রাজনৈতিক দলের নিজস্ব সশস্ত্র ক্যাডার রয়েছে যার প্রধান দায়িত্ব তাদের 'রাজনৈতিক ভিত্তি' শক্তিশালী করা এবং প্রতিদ্বন্দ্বী রাজনৈতিক দলগুলোর ক্যাডারদের মোকাবিলা করা। প্রক্রিয়াটিতে, রাজনীতি পেশিশক্তির উপর আরো নির্ভরশীল হয়ে উঠেছে।

বাংলাদেশের রাজনীতি, রাজনৈতিক ও বাণিজ্যিকভাবে হিংস্র হয়ে উঠে। নির্বাচনের সময় ভোট কারচুপি ও বন্দুকযুদ্ধ, প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীদের হত্যার পাশাপাশি নবনির্বাচিত প্রার্থীদের হত্যাও আদর্শ হয়ে দাঁড়িয়েছে এবং গণতন্ত্রের প্রতি জনগণের আস্থার উপর তীব্র প্রভাব ফেলেছে। সশস্ত্র সহিংসতার সংস্কৃতি স্ব-দলীয়দের একটি আন্তঃদলীয় প্রাতিষ্ঠানিক বৈশিষ্ট্য হয়ে ওঠে। বেশির ভাগ প্রধান

রাজনৈতিক দল এবং তাদের অধিভুক্ত ছাত্র, যুব ও শ্রমিক ইউনিয়নের মধ্যে দলাদলি ও বিচ্ছিন্ন গোষ্ঠীগুলো অবৈধ শক্তির উপর প্রচুর নির্ভর করেছিল যা হিংসাকে একটি সাধারণ রাজনৈতিক সংস্কৃতি হিসাবে পরিণত করেছিল। স্বাধীনতার ৫০ বছরের পুরো সময়কালে রাজনৈতিক দৃশ্যপট হিংস্র ছিল বলা চলে।

বিভিন্ন তথ্যসূত্রের দিকে তাকালে বাংলাদেশে রাজনৈতিক সহিংসতার একটা প্রবণতা আমরা দেখতে পাই। প্রবণতাটি ১৯৯০ সাল থেকে জোরালো হয়েছে। ২০০৬ সালে (ইসলাম) আন্তঃদলীয় দ্বন্দ্ব নিয়ে একটি সমীক্ষা, ১৯৯১ থেকে ২০০১ সাল পর্যন্ত, মোট ২৪৪২টি ঘটনা নথিভুক্ত করেছিল। বিএনপি শাসনামলে (১৯৯১-১৯৯৬) এ জাতীয় সংঘাতের সংখ্যা ছিল ১০৬৬৬, এবং আওয়ামী লীগের শাসনামলে (১৯৯৬-২০০১) ছিল ৯৭৭১। ১৯৯৬ সালের তত্ত্বাবধায়ক সরকারের সময় সংখ্যা ছিল ১০২, এবং ২০০১ এর তত্ত্বাবধায়ক সরকারের সময় এটি ছিল ৩২৮। ২০০২-২০১৩ সালের রাজনৈতিক সহিংসতার আরো ডেটাবেসএ এবং ২০১৩-২০১৮ এর মধ্যে ৩,৫৪০টি ঘটনা রেকর্ড হয়েছে। অন্য একটি ডাটাবেস ২০১০-২০১৮ (পোলম্যান, ২০১৮) এর মধ্যে ১৩,৮০০ রাজনৈতিক সহিংসতার ঘটনা রেকর্ড করেছে। মোট ১৩,৮০০ এর মধ্যে ৭০০১টি শুধু ২০১৮ সালেই এসেছিল। ২০১৯ সালে ২০৯টি ঘটনা রেকর্ড করা হয়েছিল, এবং ২০২০ সালের জানুয়ারির মধ্যে প্রায় ১২৭টি রেকর্ড করা হয়েছিল। অধিকার (২০২০ এ) তার ডাটাবেসে ২০০১-২০০৭ সালের মধ্যে রাজনৈতিক সহিংসতার এক বিস্ময়কর ২১২,৫৩৫ ঘটনা রেকর্ড করেছে, যা দুই দশককে সবচেয়ে সহিংস হিসাবে চিহ্নিত।

এসব তথ্য থেকে এটা পরিষ্কার যে রাজনৈতিক দলীয় কোন্দল বাংলাদেশের রাজনৈতিক সংস্কৃতির এক আকর্ষণীয় বৈশিষ্ট্য। তবে এটি আরো স্পষ্ট যে ১৯৯০-২০০৫-এর মধ্যে সহিংসতা ভূ-দৃশ্যকে প্রাধান্য দিয়েছিল একই সময়ে রাজনৈতিক সহিংসতার সবচেয়ে বেশি আন্তঃদলীয় ঘটনা ঘটেছিল। ২০১৫ সাল থেকে রাস্তায় বিরোধী দলগুলোর অনুপস্থিতিতে এই ধারাটি অন্যরকম পরিবর্তন হয়েছিল। ২০১৫-এর পরে রাজনৈতিক সহিংসতার সবচেয়ে বড় অংশটি ছিল আন্তঃদলীয় কোন্দল। জানুয়ারি ও মে ২০১৯ এর মধ্যে রাজনৈতিক সহিংসতার ১১৪টি ঘটনা রেকর্ড করা হয়েছিল, যার মধ্যে ৩১টি আওয়ামী লীগের বা আওয়ামী লীগের অনুমোদিত অঙ্গসংগঠনের (এএসকে, ২০১৯) এর অন্তদলীয় ঘটনা। আন্তঃদলীয় সহিংস ঘটনাগুলোর তীব্রতা ছাড়াও আওয়ামী লীগ এবং এর সাথে যুক্ত যুবলীগের বিভিন্ন ব্যক্তিরা ৮৩ বার পুলিশের সাথে সহিংস লড়াইয়ে জড়িয়ে পড়ে।

স্বাধীনতার প্রথম ২৫ বছরে রাজনৈতিক সহিংসতা মূলত রাজধানী এবং কয়েকটি বড়ো বিভাগীয় শহরগুলোতে কেন্দ্রীভূত ছিল। একাত্তর (মুক্তিযুদ্ধের বছর) থেকে শুরু হওয়া প্রথম পাঁচ বছর হিংসা সর্বব্যাপী ছিল এবং ১৯৭০-এর

দশকের মাঝামাঝি থেকে ১৯৮০-এর মাঝামাঝি সময়টি রাজনৈতিক দলগুলোর উপর নিষেধাজ্ঞার কারণে এবং সামরিক শাসকদের তৎপরতার কারণে আপেক্ষিক শান্তির সময় ছিল। জিয়ার সংক্ষিপ্ত গণতান্ত্রিক যুগে রাজনৈতিক দলগুলো মাঝে মধ্যে সহিংসতায় লিপ্ত থাকলেও খুব বেশি রাজনৈতিক সহিংসতার মুখোমুখি হয়নি। পরবর্তী দশক (১৯৮৫-১৯৯৫) রাজনৈতিক দল এবং তাদের অধিভুক্ত ছাত্র, যুবক ও শ্রমিক দলের মাধ্যমে সহিংসতার সামাজিকীকরণের প্রাথমিক দশক হিসাবে চিহ্নিত হয়েছে। বাকি ২৫ বছর দেশ ও সমাজ জুড়ে সহিংসতার প্রাতিষ্ঠানিকীকরণ চিহ্নিত করা যেতে পারে। এই সময়ের মধ্যে রাজনৈতিক বিকাশকে আবার তিনটি পর্যায়ে বিভক্ত করা যেতে পারে, (১৯৯৬-২০০৬, ২০০৬-২০১৩, ২০১৪-২০২০।) এই সময়কালে সহিংসতা ক্রমান্বয়ে রাজনৈতিক স্বাভাবিকতার প্রাতিষ্ঠানিকভাবে এবং নিয়মিত আকারে পরিণত হয়েছিল। মূলধারার রাজনৈতিক দলগুলো, তাদের ছাত্র, যুবক ও শ্রমিক শাখা, সামাজিক দল এবং নাগরিক সমাজ এবং প্রতিষ্ঠানগুলো উচ্চ পেশায় পরিণত হয়ে ওঠার কারণে রাজনীতিও ক্রমবর্ধমানভাবে তার স্বতন্ত্রতা হারিয়ে ফেলেছে। শেষ পর্যায়ে (২০১৪-২০২০) দলীয় রাজনীতি এতটাই সর্বব্যাপী হয়ে উঠল যে-কোনো কার্যকরী বিরোধী দলের অপেক্ষা দলের ভেতরে চরম দলীয় দ্বন্দ্ব বেঁধে উঠেছে। ২০১০ এর দশকের শেষের দিকে আওয়ামী লীগের ধর্মনিরপেক্ষতা তার সমাজতান্ত্রিক অংশীদারদের ফেলে দিয়ে একটি দলের নিরঙ্কুশ দলীয়তাকে চূড়ান্ত করেছিল।

রাজনৈতিক সহিংসতার একটি নতুন মাত্রা সম্প্রতি যুক্ত হয়েছে, যা হলো বোমা বিস্ফোরণ। প্রতিদ্বন্দ্বী রাজনৈতিক কর্মীদের দ্বারা তা মাঝে মাঝে ব্যবহার করা হলেও, বোমা বিস্ফোরণটি মূলত কিছু মৌলবাদি ইসলামি ধর্মীয় গোষ্ঠী ব্যবহার করে। বেশ কয়েকটি মৌলবাদী ইসলামী গোষ্ঠী উল্লেখযোগ্যভাবে *হরকাতুল জিহাদ* এবং *জামাতুল মুজাহেদীনের* বিরুদ্ধে অভিযোগ করা হয় যে এরা ১৯৯৯-২০০৫-এর মধ্যে প্রায় ৪৯৮টি বোমা বিস্ফোরণের পিছনে ছিল। এই বিস্ফোরণের লক্ষ্য মসজিদ ও মাজার, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, সিনেমা থিয়েটার এবং কোর্টের মতো প্রকাশ্য স্থানে গণহত্যা করা।

২০০৫ সালের আগস্টে, দেশব্যাপী একযোগে বোমা বিস্ফোরণটি মূলত বাংলাদেশের ৬৪টি প্রশাসনিক জেলার মধ্যে ৬৩টিতে হয়েছিল। এই সতর্কতার সাথে সমন্বিত সন্ত্রাসী হামলা প্রশাসনকে কাঁপিয়ে দিয়েছিল যার ফলে শেষ পর্যন্ত এই ইসলামি গোষ্ঠীগুলো নিষিদ্ধ হয়েছিল এবং পরে শীর্ষ নেতাদের কয়েকজনের মৃত্যুদণ্ড কার্যকর হয়েছিল। পরবর্তীতে, ২০০৯-২০১৫ সময়ে রাজপথের রাজনীতিতে রাজনৈতিক দলগুলো এবং তাদের অধিভুক্ত অঙ্গসংগঠনের দ্বারা পেট্রোল বোমার ব্যাপক ব্যবহার লক্ষ করা গেছে। এটি আন্তঃদলীয় সহিংসতার এক নতুন মাত্রা ছিল। তবে এটি আপাতত বর্তমানে অদৃশ্য।

মতাদর্শ, প্রতিষ্ঠান এবং সহিংসতা

সহিংসতা বাংলাদেশের রাজনীতিতে এতটাই প্রভাবশালী হয়ে দাঁড়িয়েছে যে এর কারণগুলো শনাক্তকরণ কার্যত অসম্ভব হয়ে পড়ে। স্পষ্টতই, নির্বাচনি সমাপ্তি, বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের দরপত্র, রাজনৈতিক প্রতিহিংসা এবং আন্তঃদলীয় বা গোষ্ঠীবাদ হলো রাজনৈতিক সহিংসতা সৃষ্টির কয়েকটি কারণ। তবে এগুলো সহিংসতার কারণ হিসাবে নয় বরং তাৎক্ষণিক কারণ হিসাবে বিবেচিত হতে পারে। সহিংসতার যে আরো তাৎপর্যপূর্ণ কারণগুলো প্রকৃতপক্ষে রাজনীতিক-আদর্শিক ইস্যু এবং রাজনৈতিক-প্রাতিষ্ঠানিক বিষয়গুলোর আশপাশে অসহিষ্ণুতা, অহংকার এবং প্রতিহিংসার রাজনৈতিক সংস্কৃতিতে আরো গভীরভাবে বদ্ধমূল। মতাদর্শ এবং প্রতিষ্ঠানের উপর রাজনৈতিক পার্থক্য স্বাভাবিক হলেও, এই ধরনের পার্থক্য থেকে সংঘটিত সহিংসতা এমন একটি বিষয় যা বাংলাদেশে অনন্য।

পলিটিকো-আদর্শিক বিষয়সমূহ

বিগত পঞ্চাশ বছরে বাংলাদেশের রাজনৈতিক মতাদর্শকে বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে দেখা যেতে পারে। বিরাট আকারে দুটি বিরোধী মতাদর্শের ধারণা রয়েছে: ধর্মনিরপেক্ষতা এবং ইসলাম। জাতীয় রাজনৈতিক ধারার ধর্মনিরপেক্ষতার পক্ষে আছে বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টি (সিপিবি), জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল (জেএসডি) এবং ওয়ার্কার্স পার্টির মতো সমাজতান্ত্রিক দল এবং কমিউনিস্ট পার্টি ও এতে অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। ধারার কেন্দ্রের বাম দিকে দাঁড়িয়ে আছে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ (আওয়ামী লীগ)। ধারার ডানদিকে রয়েছে বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল (বিএনপি) এবং জাতীয় পার্টি (জেপি)। কেন্দ্র-ডান অবস্থানের উপর দাঁড়িয়েছে বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী (জামায়াত) এবং অন্যান্য ইসলামি দলগুলো চূড়ান্ত সঠিক অবস্থান নিয়েছে। একইভাবে অন্যান্য সমস্ত দলকে ধারার চারটি পদের যে-কোনো একটিতে স্থান দেওয়া যেতে পারে।

রাজনৈতিক ধর্ম, নিয়ম ও মূল্যবোধের দিক দিয়ে দলীয় মতাদর্শের দিকে তাকালে দলগুলো স্বতন্ত্র, পাশাপাশি বেশির ভাগ ক্ষেত্রে আদর্শিক উপাদানগুলোকে ওভারল্যাপ করে চলেছে। সমাজতান্ত্রিক/সাম্যবাদী দলগুলো দ্বন্দ্ববাদী বস্তুবাদের সমাজতান্ত্রিক দর্শনের উপর ভিত্তি করে এবং ধ্রুপদি সোভিয়েত বা চীনা মডেলগুলোতে পরিকল্পিতভাবে নিরঙ্কুশভাবে ধর্মনিরপেক্ষ হয়েছে। যদিও ব্রিটিশ ভারতের সময়কালে বাংলাদেশে সমাজতান্ত্রিক/কমিউনিস্ট দলগুলোর শিকড় উত্তরাধিকারসূত্রে রয়েছে, তবে দলগুলো বাংলাদেশের দলগুলো জনগণের মধ্যে জনপ্রিয়তা অর্জনে ব্যর্থ হয়েছিল। এ জাতীয় দলগুলো কেবল নেতাকেন্দ্রিক, রাজধানী-শহরভিত্তিক এবং নির্বাচন

কমিশনের তালিকায় রয়ে গেছে। এই দলগুলোর মাঝে কয়েকটি স্বাধীনতা-পূর্ববর্তী সময় থেকেই বিপ্লবী ছিল এবং বুদ্ধিজীবীদের একটি ক্ষুদ্র কিন্তু যথেষ্ট সমর্থন-ভিত্তি ছিল যা তারা মুক্তিযুদ্ধের সময় ব্যবহার করার চেষ্টা করেছিল। বাকি কয়েকটি দল নিবন্ধিত রাজনৈতিক দল হিসাবে তারা নিয়মিত পর্যায়ক্রমিক নির্বাচনে অংশ নিয়েছিল, তবে তারা আইনসভায় জনগণের প্রতিনিধি হিসাবে নির্বাচিত হতে ব্যর্থ হয়েছিল। মুজিব আমলে হস্তক্ষেপমূলক রাজনীতির মাধ্যমে ক্ষমতায় আসার তাদের প্রয়াস মূলত সফল হয়েছিল যা অবশেষে সরকারি জাতীয়করণ নীতিতে প্রকাশ পায়। কয়েকটি বাম দল তাদের দর্শনে বিপ্লবী হওয়ার কারণে ওই দলগুলো সর্বদা সামাজিক ও রাজনৈতিক পরিবর্তনের জন্য সহিংস উপায় অবলম্বন করেছিল। স্বাধীনতার পরে এই দলগুলোর বেশ কয়েকটি সশস্ত্র অভিযানে সক্রিয় ছিল, বিশেষত বাংলাদেশের দক্ষিণ-পশ্চিমের জেলাগুলোতে এরা তৎপর ছিল। আন্তঃগোষ্ঠী এবং আন্তঃদলীয় সহিংসতা তাদের রাজনৈতিক ক্রিয়াকলাপগুলোর একটি সাধারণ বৈশিষ্ট্য হিসাবে ব্যবহৃত হতো। তবে, ১৯৮০ এর দশক শেষ না হওয়া পর্যন্ত দলগুলো বাংলাদেশের রাজনীতিতে মূলত অপ্রাসঙ্গিক থেকে যায়। এরশাদ শাসনামলে জেএসডির মতো এ জাতীয় কয়েকটি দলের সংসদে বিরোধী দল হওয়ায় প্রবোনতা দেখা যায়। ১৯৮০ এর দশকের শেষদিকে এরশাদ বিরোধী আন্দোলন এবং গণতন্ত্রের দিকে পরিবর্তনের সময় মূল ধারার দলগুলো রাজনৈতিকভাবে প্রত্যাবর্তন করে। তবে এই সময়ের মধ্যে সমাজতান্ত্রিক দেশগুলোর রাজনৈতিক পরিবর্তন এবং বিশ্বব্যাপী সমাজতন্ত্রের অবক্ষয়ের কারণে এদেশে তাদের সমর্থন হ্রাস পেতে থাকে। ওই দলগুলো তাদের রাজনৈতিক রীতিনীতি অক্ষুন্ন রেখে আওয়ামী লীগের সাথে জোট গঠনের কৌশল অবলম্বন করে। বামপন্থি এই দলগুলো ১৯৯০-১৯৯৫ এবং ২০০১-২০০৭ চলাকালীন সরকারবিরোধী পদক্ষেপে আওয়ামী লীগের সাথে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক গড়ে তোলে। ২০০৮ সালের নির্বাচনের পরে আওয়ামী লীগ নেতৃত্বাধীন জোট সরকারের অংশীদার হওয়ার কারণে দলগুলো কার্যকরভাবে তাদের সমাজতান্ত্রিক আদর্শ থেকে সরে আসে।

২০১৩ সালের নির্বাচন পরবর্তী আওয়ামী লীগ নেতৃত্বাধীন সরকারে দলগুলোকে বাদ দেওয়া হলে তাদের রাজনৈতিক মন্দা আবার শুরু হয়। আওয়ামী লীগ নেতৃত্বাধীন জোট সরকারের সাথে তাদের সময়কালে দলীয় নেতৃত্ব আনুষ্ঠানিকভাবে ইসলামিক চিন্তাধারাকে মেনে চলে। মূল ভূখণ্ডে সমাজতন্ত্রের অবসান বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক দলগুলোকে আরো অপ্রাসঙ্গিক করে দেয়।

আওয়ামী লীগেরও গত পঞ্চাশ বছরের রাজনীতিতে কিছু কিছু পরিবর্তন লক্ষ্যনীয়। এটি এর মতাদর্শগত শিকড় এবং অবস্থানগুলো কয়েকবার পরিবর্তন

করেছে এবং পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে নিজেকে সংযোজন করেছে। দলের আদর্শিক বিবর্তনটি তিনটি টার্নিং পয়েন্টে শনাক্ত করা যায়। পূর্বে উল্লিখিত, ১৯০৫ সালে প্রতিষ্ঠিত অল ইন্ডিয়া মুসলিম লীগে এই দলটির সূচনা হয়েছিল যার লক্ষ্য ছিল উপমহাদেশে একটি পৃথক মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ স্বদেশ প্রতিষ্ঠা করা যার ফলস্বরূপ পাকিস্তান সৃষ্টি হয়েছিল তৎকালীন বাংলাদেশ তার পূর্ব প্রদেশ ছিল। মুসলিম স্ব-রাজনৈতিক ও রাজনৈতিক পরিচয় এবং রাষ্ট্র প্রায় ৫০ বছর পার্টির এবং তার আন্দোলনের একক আদর্শ হিসাবে রয়ে গেছে। স্বাধীন পাকিস্তানে দলটি তার মিশনারি প্রাসঙ্গিকতা হারিয়ে ফেলে এবং বিদ্যমান পরিস্থিতিতে দলটি একটি সংকীর্ণ জাতীয়তাবাদী - অল পাকিস্তান আওয়ামী মুসলিম লীগ-এ পরিণত হয়। যাহোক, দলটি ঐক্য থেকে বাঙালি জাতীয় পরিচয়ের দিকে তার আদর্শকে আরো সরানোর মাধ্যমে একটি আঞ্চলিক ক্ষেত্রে আরো সরে যায়। দলটি আনুষ্ঠানিকভাবে তার নাম থেকে 'মুসলিম' বাদ দেয় এবং কেবল পাকিস্তান আওয়ামী লীগে পরিণত হয়। এটি তার আদর্শের এক কঠোর পরিবর্তন ছিল যার মাধ্যমে তার মুসলিম পরিচয় থেকে ধর্মনিরপেক্ষ বাঙালি জাতিগত পরিচয়ে পরিচিত করে। কয়েক দশক পরে এটি বাংলাদেশ আওয়ামী লীগে পরিণত হয়।

পাকিস্তানের আমল থেকেই আওয়ামী লীগ তার বাংলা ভাষাতাত্ত্বিক এবং জাতিগতভিত্তিক আদর্শিক অবস্থান কঠোরভাবে বজায় রেখেছে। তবে দুটি মৌলিক ইস্যুতে দলটি আনুষ্ঠানিকভাবে উল্লেখযোগ্যভাবে বিকশিত হয়েছিল। প্রথমত, দলের স্বাধীনতা-পূর্ব নেতৃত্বের দৃঢ় 'মুসলিমপন্থি' চিন্তাধারা ছিল। এর প্রধান নেতৃবৃন্দ যেমন হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী, আবুল মনসুর আহমদ, আবদুর রশিদ তর্কবাগীশ এবং শেখ মুজিবুর রহমান পাকিস্তান আন্দোলনের প্রত্যক্ষ নেতৃত্বে ছিলেন। ১৯৫০ এর দশকের গোড়ার দিকে ধর্মনিরপেক্ষ বাঙালি জাতীয়তাবাদ বিকশিত হয়। সত্তরের দশকের আগ পর্যন্ত পার্টির অমুসলিম সমর্থন তেমনটা প্রত্যক্ষ ছিল না, তবে বাঙালি হিন্দুরা তখনও আওয়ামী লীগের পক্ষে থাকতে স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করেছিল। সুতরাং দলটি ধর্মনিরপেক্ষ হয়ে উঠলেও, তার নেতৃত্বের নস্টালজিক আবেগ ১৯৬০ এর দশকে মূলত 'মুসলিম' মেন্টালিটি বজায় রেখেছিল। সুতরাং রাজনৈতিক আদর্শ হিসাবে বাঙালি জাতীয়তাবাদকে উৎসাহিত করা সত্ত্বেও দলটি মুসলিম ও ইসলামি সংস্কৃতিকে প্রাধান্য দেয়। যাহোক, মুজিব যুগের প্রাথমিক বছরগুলোতে ধর্মনিরপেক্ষ বামপন্থিদের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে ইসলাম ও ইসলামিক পরিচয় সম্পর্কে একটি নিয়মতান্ত্রিক অফিসিয়াল শুদ্ধি গ্রহণ করা হয়েছিল। দ্বিতীয়ত, স্বাধীনোত্তর আওয়ামী লীগ এই আখ্যানকে উলটে দিয়েছে এবং মুসলিম ও ইসলামিক সংস্কৃতির চেয়ে বাঙালি ও নৃতাত্ত্বিক সংস্কৃতিকে প্রাধান্য দিয়েছে। সুতরাং স্পষ্টতই যে দলটির আদর্শিক অবস্থানগুলো ধর্মনিরপেক্ষ বাঙালিজম এবং বাঙালি জাতীয়তাবাদের অবসান

ঘটিয়ে একটি দীর্ঘ পথচক্রের মধ্য দিয়ে বিকশিত হয়েছে। অর্থনৈতিকভাবে বলতে গেলে, দলটি পুঁজিবাদী চিন্তার কাঠামোতে মিলিত হয়েছে এবং রাজনৈতিকভাবে এটি উদারপন্থার নীতি অবলম্বন করেছে (রাশেদুজ্জামান, ১৯৯৪; আনিসুজ্জামান, ২০০০)।

কেন্দ্র-ডান দলগুলোর রাজনৈতিক মতাদর্শগুলো বিএনপি এবং জাতীয় পার্টি কেন্দ্রিক। তারা তাদের দলগুলোকে বাংলাদেশি মুসলিম জাতীয়তাবাদের ধারণার উপর ভিত্তি করে গড়ে তুলেছে যা ভৌগোলিক পরিচয় এবং ধর্মীয় সংখ্যাগরিষ্ঠতা বোঝায়। এর মাধ্যমে তারা ভারতের পশ্চিমবঙ্গ প্রদেশের বাঙালি জনগোষ্ঠী থেকেও যে জাতিগতভাবে বাঙালি, সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলিম বাংলাদেশি জনগোষ্ঠীর অনন্য তা প্রমাণ করার চেষ্টা করে। একই ইস্যুতে তারা একটি আধুনিক জাতির ন্যায়সংগততা এবং স্বাধীনতাকে একসূত্রে আবদ্ধ করে। এই মূল ইস্যু ব্যতীত এই দলগুলো মূলত তাদের রাজনৈতিক মনোভাব এবং নীতিতে উদারপন্থি। সুতরাং দেখে মনে হচ্ছে এই দলগুলো স্বাধীনতা পূর্ব আওয়ামী লীগের 'মুসলিম' আচ্ছাদন বহন করে। অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকে দলগুলো পুঁজিবাদী উদারপন্থার পক্ষে। এই দুটি প্রধান দল স্বাধীনতার পূর্বের আদর্শিক উত্তরাধিকার ব্যতিরেকে স্বাধীনতার অনেক পরে এবং চার দশক ধরে রাজনৈতিক বিবর্তনে অপরিবর্তিত থেকে যায় (কবির, ১৯৯০; সত্যমূর্তি, ১৯৭৯; খান, ১৯৮৫; হোসেন, ১৯৮৮; জাফরুল্লাহ, ১৯৯৬; হোসেন) এবং খান, ২০০৬)।

তবে, জামায়াতে ইসলামী পাকিস্তানকে কেবল একটি মুসলিম রাষ্ট্র নয়, ইসলামিক রাষ্ট্র হিসাবে গড়ে তোলার পক্ষে ছিল। পাকিস্তান আমলে দলটি তার রাজনৈতিক মিশন অপরিবর্তিত রেখেছিল এবং ১৯৭১ সালে এটি বাংলাদেশের স্বাধীনতার বিরোধী ঐক্যবদ্ধ পাকিস্তানের ধারাবাহিকতা সমর্থন করে। ইসলামি সংহতি ও পাকিস্তান আন্দোলনের নস্টালজিক উত্তরাধিকার দ্বারা স্বীকৃত এই দলটি একটি সমঝোতার সূত্রে মুসলিম ঐক্যকে অগ্রাধিকার দিয়েছে। জামায়াতের মতো তৎকালীন অনেক ইসলামি দল যেমন খিলাফত আন্দোলন ও নিজাম ই ইসলামি স্বাধীনতা বিরোধী অবস্থান নিয়েছিল। এই দলগুলো আদর্শে ইসলামি হলেও বিশেষত জামায়াত মূলত অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিকভাবে উদার এই অর্থে যে তারা রাজনৈতিক উদারপন্থার কাঠামোর মধ্যে রাজনীতি করার পক্ষে। ইসলামি বিধি সম্পর্কে কিছু অতিমাত্রায় উপলব্ধি ব্যতীত তারা কার্যত কোনো ইসলামিক বিকল্প প্রস্তাব করে না (কবির, ১৯৯০)।

সুতরাং উপরের বর্ণনা থেকে এটি স্পষ্ট যে বড়ো রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে চরম আদর্শগত পার্থক্য বজায় থাকলেও একই সাথে তাদের রীতিনীতি, মূল্যবোধ এবং রাজনৈতিক নীতিগুলো যথেষ্ট পরিমাণে ওভারল্যাপ হয়।

সুবিধাজনক পরিস্থিতিতে তারা একমত হয় তবে তারা অত্যন্ত পরিমাণে পারস্পরিক অসহিষ্ণু।

সাংবিধানিক ধর্মনিরপেক্ষতা ও ধর্ম

দ্বিতীয় গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক বিষয় যা রাজনৈতিক দলগুলোকে গভীরভাবে বিভক্ত করে রাখে তা হলো সংবিধানে ধর্মনিরপেক্ষতার বিষয়টি (মনিরুজ্জামান, ১৯৯০)। আওয়ামী লীগ ও বাম দলগুলো রাজনীতিতে সম্পূর্ণ ধর্মনিরপেক্ষতার শক্তিশালী সমর্থক। এই দলগুলো দেশে ধর্মীয় রাজনৈতিক দলগুলোকে নিষিদ্ধ করার পক্ষে যুক্তি দেয়। দলগুলো রাজনীতিকে ধর্ম থেকে আলাদা করার ইচ্ছা পোষণ করার আংশিক কারণ হলো একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধের স্বাধীনতা বিরোধী ভূমিকার জন্য ধর্মীয় দলগুলোর ভূমিকা (ইসলামি দলগুলো, যেহেতু বাংলাদেশে আর কোনো ধর্মীয় দল নেই) ।

দক্ষিণপন্থি বা কেন্দ্র-ডান দলগুলো বিশ্বাস করে যে সম্পূর্ণ ধর্মনিরপেক্ষতা সম্ভব নয়। এই দলগুলো যুক্তি দিয়েছিল যে বাংলাদেশি জাতীয়তাবাদের প্রেক্ষাপটে ধর্মনিরপেক্ষতাকে বাংলাদেশি মুসলিম সাংস্কৃতিক প্রভাবের দিকে ঝুঁকতে হবে। অন্যদিকে ধর্মীয় রাজনৈতিক দলগুলো ধর্মনিরপেক্ষতার তীব্র বিরোধী যুক্তি দেয় যে ধর্মনিরপেক্ষতা সম্পূর্ণরূপে অপ্রয়োজনীয়। তাদের রাজনৈতিক মতাদর্শের কারণে, ইসলামি রাজনৈতিক দলগুলো সংবিধান থেকে ধর্মনিরপেক্ষতার সম্পূর্ণ অবসান এবং একটি ইসলামি রাজনৈতিক ব্যবস্থা প্রবর্তনের পক্ষে কাজ করে।

সংবিধানে ইসলামি উপাদান রাখা বা অপসারণের বিধান সম্পর্কে রাজনৈতিক দলগুলোর অস্বস্তিহীন, অস্পষ্ট ও বিরোধী অবস্থান অনিশ্চিত। সংবিধানে ইসলামি উপাদান উপস্থিত হওয়া নিয়ে রাজনৈতিক বিতর্ক বারবার সাংবিধানিক সংশোধনী নিয়ে আসে। ধর্মনিরপেক্ষতাবাদী মুজিব যুগের (আওয়ামী লীগ) ১৯৭২ সালের সংবিধানে ধর্মনিরপেক্ষতাকে চারটি আদর্শিক ভিত্তির মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করেছিল; তবে ১৯৭৯ সালে পঞ্চম সংশোধনীর মাধ্যমে মুসলিম উদারবাদী জিয়া যুগে (বিএনপি) এটি নির্মূল করা হয়। অতিরিক্তভাবে, জাতিকে একটি বৃহত্তর ইসলামি লেবেল দেয়ার জন্য একই সংশোধনীটি এনক্রিপ্ট করা হয়। ১৯৮৮ সালের অষ্টম সংশোধনীতে এরশাদ সরকার ইসলামকে সরকারি রাষ্ট্রীয় ধর্ম হিসাবে ঘোষণা করার জন্য আরো এক ধাপ এগিয়ে যায়। সুতরাং প্রগতিশীলভাবে ইসলাম ধর্মনিরপেক্ষতাকে একটি আদর্শ হিসাবে রেখে সংবিধানের অভ্যন্তরে প্রবেশ করছিল। জিয়ার সংশোধনীগুলো যুক্তিযুক্তভাবে তাঁর মুসলিম জাতীয়তাবাদের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ ছিল এবং এরশাদের উদ্দেশ্য ছিল তাঁর সরকারের প্রতি মুসলমানদের রাজনৈতিক

সহানুভূতি এবং সমর্থন অর্জন করা। আওয়ামীলীগ ও অন্যান্য ধর্মনিরপেক্ষ বামপন্থি দলগুলো কখনো এ জাতীয় সংশোধনী গ্রহণ করেনি এবং জিয়ার ধর্মনিরপেক্ষতা বাদ দেওয়ার বিপক্ষে আইনি চ্যালেঞ্জ করেছিল এবং ২০০৫ সালে আদালতে লড়াইয়ে জিতেছিল।

মুক্তিযুদ্ধের রাজনীতি একটি তৃতীয় গুরুত্বপূর্ণ জাতীয় রাজনৈতিক ইস্যু যা সকল রাজনৈতিক দলগুলোকে একত্রিত করলেও দু-একটি রাজনৈতিক দল কর্তৃক বিরোধীতা লক্ষ করা যায় এবং জাতিকে বিভক্ত করার অপচেষ্টা চালানো হয় (বার্তোচি, ১৯৮৫)। তৎকালীন সর্বাধিক জনপ্রিয় দল হিসাবে সমর্থিত এবং মূলত মুক্তিযুদ্ধের নেতৃত্ব দিয়েছিল আওয়ামী লীগ। অন্যান্য দল এবং বিপুল সংখ্যক মুক্তিযোদ্ধা যারা কর্মী বা কোনো রাজনৈতিক দলের সমর্থক ছিলেন না তারাও স্বতঃস্ফূর্তভাবে যুদ্ধে অংশ নিয়েছিলেন। তবে কিছু কেন্দ্র-ডান ও ইসলামি রাজনৈতিক দল যেমন মুসলিম লীগ, জামায়াতে ইসলামী এবং নিজাম-ই-ইসলামি সংযুক্ত পাকিস্তানের পক্ষে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছিল এবং মুক্তিযুদ্ধের বিরোধিতা করেছিল (হোসেন ও সিদ্দিকী, ২০০৪)। দলগুলোর বিশেষ ভূমিকা পরবর্তীতে স্থায়ীভাবে বাংলাদেশে পন্থী ও স্বাধীনতাবিরোধী এই দুই শিবিরে পোলারাইজ করে এবং দলগুলোর মধ্যে রাজনৈতিক কোন্দল সৃষ্টি করতে থাকে (লিফসচল্টজ, ১৯৭৯)। আওয়ামী লীগ অন্য কোনো দলের সাথে তার ক্রেডিট ভাগ করে নেওয়ার পাশাপাশি আওয়ামী লীগ শিবিরের বাইরে মুক্তিযোদ্ধাদের স্বীকৃতি দিতে রাজি নয়। মুক্তিযুদ্ধের বিষয়ে আওয়ামী লীগের একচেটিয়া দাবি যুদ্ধের ক্ষেত্রে সেনাবাহিনীর অন্যতম সেক্টর কমান্ডার জিয়ার প্রত্যাখ্যানের পর্যায়ে চলে গেছে। ইসলামি রাজনৈতিক দলগুলো স্বাধীনতা বিরোধী শক্তি হিসাবে পরিচিত, অন্যদিকে বিএনপি ও জাপা এই দলগুলোতে অনেক মুক্তিযুদ্ধ বিরোধী রাজনীতিকদের রাজনৈতিক শোষণ এবং পুনর্বাসনের কারণে স্বাধীনতাবিরোধী শক্তির নিকটতম মিত্র বলে মনে করা হয়। বারবার আওয়ামী লীগ ও বামপন্থি দলগুলো ১৯৭১ সালে তাদের ভূমিকার কারণে বাংলাদেশে ধর্মীয় রাজনৈতিক দলগুলোকে নিষিদ্ধ করার জন্য নির্বাচন কমিশনের কাছে তাদের দাবি জানায়; তবে ক্ষমতায় আসার পরে তারা কখনো এই পদক্ষেপ শুরু করেনি (মিলাম, ২০০ ২০০৭)।

একটি রাজনৈতিকভাবে সংবেদনশীল বিষয় হচ্ছে- কারা স্বাধীনতার ঘোষণা দিয়েছে? ঐতিহাসিকভাবে এই প্রশ্নটির বিতর্কটি স্বাধীনতার প্রথম দুই দশক পর্যন্ত নিষ্পত্তি ও আপসহীন থেকে যায়। ১৯৯০-এর দশকে বিষয়টি পুনরায় উত্থিত হয়। ১৯৯০-এর দশকে আওয়ামী লীগের নিরলস সরকার বিরোধিতা জনসাধারণের মধ্যে অনুভূতি তৈরি করার চেষ্টা করেছিল যে বিএনপি সরকার মুক্তিযুদ্ধের আদর্শের সাথে সমঝোতা করেছিল এবং স্বাধীনতাবিরোধী শক্তিকে

শক্তিশালী করেছিল। ১৯৯৬ সালে আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় আরোহণের পর সমর্থনের ভিত্তিকে একীভূত করার একটি সুযোগ নিয়েছিল। এর মধ্যে দুটি হলো- স্বাধীনতার ঘোষণা এবং যে ব্যক্তি এটি ঘোষণা করেছিল। আওয়ামী লীগ এই দুটি ইস্যুতে রাজনৈতিকভাবে এতটাই আচ্ছন্ন ছিল যে ২০০৮ সালের নির্বাচনের পরে ক্ষমতায় আসার পর এই দাবির পক্ষে স্বাধীনতার ঘোষণার তারিখ এবং ঘোষণাপত্রে আইনি এবং সাংবিধানিক সুরক্ষা নিশ্চিত করা হয়েছিল।

রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান

ইসি (নির্বাচন কমিশন) ও সিইসি (প্রধান নির্বাচন কমিশনার) মতো গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানের উপর মতবিরোধের কারণে রাজনৈতিক সহিংসতা ১৯৯৫-২০১৫ সময় সীমায় প্রায় বিশ বছরব্যাপী একটি প্রভাবশালী বৈশিষ্ট্যে পরিণত হয়। স্বাধীনতার প্রথম দুই দশকে দেশটি কার্যত নাগরিক স্বৈরাচারবাদ, সামরিক একনায়কতন্ত্র এবং একদলীয় এবং ব্যক্তিগত শাসনের অধীনে থেকে যায় (বাক্সার, ১৯৮২; জিরিং, ১৯৯৪)। এক ব্যক্তি বা এক পক্ষের দ্বারা রাজনৈতিক ক্ষমতার আধিপত্য কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ জাতীয় রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানের বিচ্ছিন্নতা রোধ করে (আমিন, ১৯৯২)। সংসদীয় যুগে রাজনৈতিক সংঘাতের এক গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্র হয়ে উঠেছে এমন একটি মূল প্রতিষ্ঠান হলো নির্বাচন কমিশন (ইসি)।

ইসি নির্বাচনের ব্যবস্থা ও তদারকির জন্য দায়বদ্ধ একটি সাংবিধানিক সংস্থা। এটি হলো একটি স্বায়ত্তশাসিত সংস্থা যার আইন অনুসারে বৈধ আইনি ক্ষমতা রয়েছে। প্রধানমন্ত্রীর আওতাধীন সংস্থাটি যদিও সম্পূর্ণ স্বায়ত্তশাসিত এবং রাজনৈতিকভাবে নিরপেক্ষ বলে মনে করা হয়। তবে, গভীর অবিশ্বাসের প্রেক্ষিতে ক্ষমতাসীন দলগুলো নির্বাচনি বিজয় নিশ্চিত করতে ইসিকে বৈধ প্রতিষ্ঠান হিসাবে ব্যবহার করার প্রবণতা পোষণ করেছিল। অন্যদিকে সিইসি নিরপেক্ষতা নিয়ে বিরোধীরা সন্দেহজনক রয়ে গেছে। ১৯৯০ এর দশকের মাঝামাঝি পর্যন্ত ইসি মোটামুটি একটি বিশ্বাসযোগ্য প্রতিষ্ঠান ছিল। তীব্র দলীয় রাজনীতি ১৯৯০ এর দশকের মাঝামাঝি বিএনপি ইসিকে পুরোপুরি রাজনীতিকরণ করেছে। ২০২০ সালের মধ্যে প্রতিষ্ঠানটি ক্ষমতাসীন দল আওয়ামী লীগের নির্বাচন কমিটির একটি ব্রাঞ্চ হিসাবে কাজ করে বলে নানা অভিযোগ উঠেছে। রাকিব ও হুদা নেতৃত্বাধীন সর্বশেষ দুটি কমিশন ইসি ও আওয়ামী লীগকে ওভারল্যাপিং প্রতিষ্ঠান হিসাবে পরিণত করেছে।

১৯৯১-২০০৬-এর সময়কালীন সমস্ত ক্ষমতাসীন দলগুলো নির্বাচনের প্রাক প্রতিশ্রুতি সত্ত্বেও ইসিকে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের প্রভাব থেকে পৃথক করতে ব্যর্থ হয়েছিল। ১৯৯৪, ১৯৯৫ এবং ২০০১ এর নির্বাচনের সময় নির্বাচন কমিশন

রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে পার্থক্যের কেন্দ্রবিন্দুতে পরিণত হয়েছিল। বিরোধী বিএনপি এর আগে দাবি করেছিল যে রাজনৈতিক ক্ষমতাসীন দল-নিযুক্ত ইসি কমিশনার সাইদ একজন পক্ষপাতদুষ্ট ব্যক্তি এবং ২০০১ সালের সাধারণ নির্বাচনে অংশ নেবে না বলে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল। ২০০১-২০০৬ বিএনপি শাসনামলে এবং বিশেষত ২০০৫ ও ২০০৭ সালের সময়ে আওয়ামী লীগের নেতৃত্বে বিরোধী ফ্রন্ট বিদায়ী বিএনপি কর্তৃক নিযুক্ত নির্বাচন কমিশনারের অধীনে নির্বাচনে অংশ নিতে অস্বীকার করে এবং তাকে অপসারণের দাবি জানিয়েছিল। সিইসি একটি সাংবিধানিক পদ এবং সংবিধান অনুযায়ী নিয়োগ দেওয়া হয়েছে বলে দাবি করে বিএনপি ফ্রন্ট তার অপসারণের বিরোধিতা করেছে। আওয়ামী লীগ অভিযোগ তুলেছিল যে তৎকালীন সিইসি পক্ষপাতদুষ্ট, ইসির সম্পূর্ণ সংস্কারের দাবি জানিয়েছিল এবং ২০০৬ সালের ১৫ জুলাই ১৫ দফা সংস্কার প্রস্তাব উপস্থাপন করে। কিন্তু বিএনপি সরকার এই দাবিটি মানতে রাজি ছিল না। এই বিষয়টি ২০০৬ সালে ক্ষমতাসীন ও বিরোধী দলের মধ্যে বিক্ষোভ ও ধর্মঘটের মাধ্যমে একাধিক রাস্তায় রাজনৈতিক দ্বন্দ্বের জন্ম দেয়। ২০০৬ সালের অক্টোবরে বিএনপি সরকার তত্ত্বাবধায়ক সরকারের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তর করার পর আওয়ামী লীগ আরো বেশি সহিংস হয়ে ওঠে। দেশব্যাপী ধর্মঘট ও রাস্তায় ২০০৫ সালের ২৮ অক্টোবর থেকে ৮ জানুয়ারি ২০০৬ পর্যন্ত সহিংসতা বিরাজ করেছিল যাতে কয়েক ডজন মানুষ প্রাণ হারায়।

তত্ত্বাবধায়ক সরকার নিজেই আরেকটি নির্বাচন কমিশন গঠন এবং তার ক্ষমতার বিষয়ে ওই সময় রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে পার্থক্য ছিলো। সিইসি বা প্রধান নির্বাচন কমিশনার ১৯৯০ এর দশকের মাঝামাঝি নির্দলীয় টেকনোক্র্যাটদের নেতৃত্বে অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের একটি স্তম্ভ ছিল। নব্বইয়ের দশকে সাহাবুদ্দিন আহমদ এবং হাবিবুর রহমানের নেতৃত্বে প্রথম দুটি নির্বাচন কমিশন মোটামুটি ভালোভাবে কাজ করেছিল এবং সিস্টেমটি একটি সাংবিধানিক স্থায়িত্ব অর্জন করেছে বলে মনে হয়। তবে ২০০১ সালের সাধারণ নির্বাচনে পরাজিত হওয়ার পর আওয়ামী লীগ সিইসির বিরুদ্ধে একটি শক্ত সমালোচনামূলক অবস্থান গড়ে তোলে। ১৫ জুলাই ২০০৫-এ বিরোধী আওয়ামী লীগও সিইসি সংস্কারের জন্য ৫ দফা প্রস্তাব উপস্থাপন করে, যা আবারও ক্ষমতাসীন জোট বিবেচনা করতে রাজি ছিল না। ২০০৫ সালের অক্টোবরে ক্ষমতা গ্রহণের পর আওয়ামী লীগ বিশেষত সিইসির বিরুদ্ধে অবস্থান নেয়। ইসির ইস্যু নিয়ে প্রথমে আওয়ামী লীগের ফ্রন্ট সিইসির মুখোমুখি হয়েছিল। যখন অনেক সহিংসতার পরে এটি সমাধান করা হয়েছিল, তখন আওয়ামী লীগ নিজেই প্রধান বিচারপতি তত্ত্বাবধায়ক উপদেষ্টা হিসাবে রাষ্ট্রপতির পদত্যাগের দাবিতে সিইসির দিকে ঝোঁকে। এর ফলে রাষ্ট্রপতি 'জরুরি অবস্থা' ঘোষণা না হওয়া পর্যন্ত উপদেষ্টা বোর্ড ও রাজনৈতিক অচলাবস্থার ধারাবাহিক রদবদল

ঘটিয়েছিল। এক দশক আগে কমনওয়েলথ থেকে অব্যাহত বিদেশি মধ্যস্থতাকে আমন্ত্রণ জানিয়ে একই রকম অচলাবস্থার অভিজ্ঞতা হয়েছিল। ২০২০ সালের মধ্যে আওয়ামী লীগ বাংলাদেশের রাজনীতি থেকে সিইসি স্থায়ীভাবে নির্বাসিত করার জন্য সংবিধান সংশোধন করতে সফল হয়েছে। সকল নির্বাচন এখন একটি স্থায়ী সরকারের অধীনে অনুষ্ঠিত হবে। এটি এমন একটি ব্যবস্থা যাতে সিইসি পরিচালিত প্রতিষ্ঠানের উপর দলগুলোকে আর আস্থা রাখতে হবে না। ১৯৯০ এর দশকের গোড়ার দিকে রাজনৈতিক স্থিতিশীলতার জন্য ইসি সিস্টেমটি ঐকমত্যের মাধ্যমে একটি সাংবিধানিক প্রক্রিয়া ছিল, তবে এটি এখন দলীয়তন্ত্রের পক্ষে সাংবিধানিকভাবে অপ্রয়োজনীয় হয়ে পড়েছে।

দলীয় রাজনীতি এবং সহিংসতা: ৫০ বছরের চিত্র

বিগত ৫০ বছরে বাংলাদেশের রাজনীতি অত্যন্ত পক্ষপাতদুষ্ট। দলীয় নেতাদের নির্বাচনি পরাজয় মেনে নিতে নারাজ হওয়ার কারণে পক্ষপাতমূলক প্রবণতা দেখা দিয়েছে। রাজনৈতিক সহিংসতা, নির্বাচনি দুর্নীতি এবং সরকারের অভিযোগযুক্ত অবৈধতা দাবির দ্বারা অনেক বেশি বৈধতাযুক্ত। নির্বাচনি দুর্নীতি বিস্তৃত হলেও এ ঘটনাটি স্বীকার করে কেবল পরাজিত দলই; বিজয়ী দলগুলো সর্বদা এটি অস্বীকার করে। বিশ্বাসযোগ্য বিরোধী দলের অভাবে নির্বাচনি দুর্নীতি বিনা প্রতিরোধে চলে যায়। যেমনটি ১৯৭০ এর দশকের গোড়ার দিকে নির্বাচনের অভিজ্ঞতা হয়েছিল। তবে, সমানভাবে শক্তিশালী বিরোধী দলগুলোর উপস্থিতিতে নির্বাচন দুর্নীতি দীর্ঘস্থায়ী এবং অবিচ্ছিন্ন রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতা তৈরি করে যা ১৯৯০ এর দশকের গোড়ার দিকে অনুধাবন করা হয়েছিল। ১৯৯০ সালের পর থেকে রাজনৈতিক হিংস্রতার বেশির ভাগই নির্বাচনি দুর্নীতির জন্য দায়ী করা যেতে পারে। নির্বাচনি দুর্নীতির বিরুদ্ধে বিরোধীদের জেদ এবং বিজয়ী বা ক্ষমতাসীন দলের দ্বারা এটি প্রত্যাখ্যান সর্বদা রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতা এবং সহিংসতার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। এই ধরনের সহিংসতা আনুষ্ঠানিক এবং অনানুষ্ঠানিকভাবে ঘটে। এর নিম্নলিখিত কিছু প্রকাশ রয়েছে।

সংসদীয় অধিবেশন বর্জনের মাধ্যমে রাজনৈতিক সহিংসতা

সংসদীয় অধিবেশন বর্জন সংসদীয় গণতন্ত্রে একটি মানসম্মত অনুশীলন। বিরোধী দলগুলো যখন নির্দিষ্ট নীতিগুলোর বিষয়ে সরকারের অবস্থানের সাথে দৃঢ়ভাবে একমত হয় না এবং তারা এ জাতীয় নীতি আইনে পরিণত করার কোনো যৌক্তিকতা খুঁজে পায় না, তখন দলগুলো প্রতিবাদে সংসদ অধিবেশনগুলোতে বয়কট করে। এই পদ্ধতিটি ১৯৮০ এর দশকের শেষদিকে বেশি ব্যবহৃত হয়নি। ১৯৮০-এর দশকের মাঝামাঝি পূর্বে সংসদসমূহের আসলে অর্থবহ এবং দৃঢ় বিরোধিতা ছিল না এবং তদতিরিক্ত, সংসদীয়

শিষ্টাচারগুলো যখন প্রয়োজন হয় তখন অনেক ব্যবহৃত হতো তবে ১৯৯১-২০০৬ সংসদীয় যুগে বাংলাদেশের সংসদে বিরোধী দলগুলো এই পদ্ধতিটি ব্যাপকভাবে ব্যবহার করেছে। ১৯৯১-২০০৬ সময়কালে তিনটি সংসদই প্রধান বিরোধী দলের দ্বারা প্রায় সম্পূর্ণ বয়কট ছিল। তিনটি সংসদের প্রত্যেকেই বিরোধী বয়কটের মাধ্যমে প্রথম অধিবেশন শুরু করেছিল। সর্বশেষ সংসদে একটি সমীক্ষায় দেখানো হয়েছে যে ২০০৪ সালে বিরোধী দল (আওয়ামী লীগ) মোট ৮৩টি সংসদীয় কার্য দিবসের মধ্যে ৪৮টি বয়কট করেছিল। ২০০৫ সালে, এটি (আওয়ামী লীগ) ৬২ কার্যদিবসের মধ্যে ৬১ দিনই বর্জন করেছে। ২০০১-২০০৪ সময়কালে, বিরোধীরা মোট ৩০২ কার্যদিবসের মধ্যে কেবল ৮৭টিতে উপস্থিত ছিলেন। ২০০২-০৬ এ অধিবেশন চলাকালীন বিরোধীরা তিন মাস বয়কট করেছিল।

সংক্ষিপ্তভাবে সংসদ বর্জন বিরোধী পক্ষের কিছু দাবির বিষয়ে সংঘটিত হয়, যা সরকার পূরণ করার সম্ভাবনা কম। সংসদীয় বয়কটের জন্য দেওয়া সাধারণ কারণগুলো হলো: বিরোধীদের সংসদে কথা বলার উপযুক্ত সুযোগ না দেওয়া, স্পিকারের পক্ষপাতমূলক আচরণ, বিরোধী গতিবিধি প্রত্যাখ্যান করা এবং বিরোধী দলের সুযোগ সুবিধাগুলো লঙ্ঘন (আহমেদ, ২০০২)। বিরোধী দলগুলো বর্জনের জন্য তাদের কারণগুলো বৈধ বলে দাবি করে, সরকার সবসময় অন্য চিন্তা করে। বয়কটের রাজনীতিতে সবচেয়ে বড়ো সমস্যা হলো বিরোধীরা বয়কটের বিষয়টি রাস্তায় নিয়ে যায়। সংসদীয় অধিকারের দাবিতে বৃহত্তর জনসমাবেশ ও বিক্ষোভ মিছিল করা হয় যা ক্ষমতাসীন দলের সমর্থকরা একই জাতীয় উদ্যোগের দ্বারা প্রতিহত করে। এই জাতীয় অনুষ্ঠানে সশস্ত্র সংঘর্ষ সাধারণত রক্তপাতের অবসান ঘটে যা বিরোধীদের কঠোর অবস্থানের দিকে নিয়ে যায়, বয়কট রাজনীতিকে আরো এগিয়ে নিয়ে যায়। সংসদীয় বয়কটের পরে দীর্ঘকালীন রাস্তায় রাজনীতির এমন উদাহরণ ১৯৯০ এবং ২০০০ এর শুরুর দিকেই স্পষ্ট। ২০১০ এর দশকে এই প্যাটার্নটির পরিবর্তন ঘটে যখন প্রধান বিরোধীরা নির্বাচনে অংশ নেওয়া থেকে বিরত থাকে। সুতরাং বিরোধী দল সরকারের পদত্যাগের দাবিতে এবং অবাধ ও নিরপেক্ষ নির্বাচনের দাবিতে রাস্তায় রাজনীতি করেছিল যা বাংলাদেশের রাজনৈতিক সহিংসতার মাত্রা ও প্যাটার্নকে বদলে দিয়েছিল। ক্ষমতাসীন ও বিরোধী দলের মধ্যে সহিংস সংঘাত সারা দেশে চরমভাবে উত্তপ্ত হয়ে উঠল। আইনজীবী ও রাজনৈতিক উভয় ক্ষেত্রেই আওয়ামী লীগ সরকারের শক্তিশালী, কঠোর এবং দমনমূলক নীতিগুলো এই দশকে হরতাল রাজনীতির ক্ষয়ের মুখোমুখি হয়েছিল, যেটিকে বিরোধীরা দুই দশক ধরে সরকারবিরোধী আন্দোলনের মূল কৌশল হিসাবে ব্যবহার করেছিল। তবে অতীতের যে-কোনো সময়ের তুলনায় সহিংসতা ও সহিংসতা জনিত হতাহতের ঘটনা ও ধ্বংসের মাত্রা তুলনামূলকভাবে বেশি ছিল।

সরকারের আইন প্রয়োগকারী সংস্থাগুলো, আইনি সংস্থা এবং অনানুষ্ঠানিক ভাড়াটেদের অপ্রতিরোধ্য দমনমূলক উপস্থিতির মধ্য দিয়ে বিরোধী দলকে রাস্তায় ফেলে রাজনীতি থেকে কার্যত সরিয়ে আনা হয়েছিল।

হরতাল ও ধর্মঘটের মাধ্যমে সহিংসতা

বাংলাদেশের দলীয় রাজনীতিতে হরতাল ও শ্রমিক ধর্মঘট দুটি সাধারণভাবে ব্যবহৃত রাজনৈতিক অস্ত্র। শ্রম ধর্মঘট সীমাবদ্ধ এবং সেক্টরভিত্তিক যেমন কোনো নির্দিষ্ট শিল্পের পরিবহণ বা শ্রমিক ইউনিয়ন দ্বারা হতে পারে। বিরোধী দলগুলো জনগণের উপর হরতালকে চাপিয়ে দিয়ে বাধ্যতামূলকভাবে দেশের প্রতিটি ক্ষেত্র যেমন : পরিবহণ, অফিস, ব্যবসায়িক কার্যক্রম, শিল্প উৎপাদন, ব্যাংকিং এবং লেনদেন ইত্যাদি বন্ধ রেখে স্থায়ী সরকারের বিরোধিতা করার জন্য জনগণের উপর চাপ প্রদান করে।

বাংলাদেশের রাজনীতির ইতিহাসে বিরোধীরা হরতালকে বহুল ব্যবহৃত উপায় হিসাবে ব্যবহার করেছে (ইসলাম ২০০৫) হরতাল পাকিস্তানের দিনগুলোতে সরকার বিরোধী আন্দোলনের পক্ষে কার্যকরভাবে নিযুক্ত হয়েছিল। ইউএনডিপি (২০০৫) এর এক প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, ১৯৯৪ থেকে ২০০২ সালের মধ্যে প্রায় ১,১২২টি হরতাল কার্যকর করা হয়েছিল। ১৯৪৭ থেকে ১৯৫০ সালের মধ্যে একটি, হরতাল ১৯৫১ থেকে ১৯৫৪ সালের মধ্যে ১টি, ১৯৫৫ ও ১৯৫৮ সালের মধ্যে ১টি, ১৯৫৯ থেকে ১৯৬২ সালের মধ্যে ১টি, ১৯৬৩ থেকে ১৯৬৬ সালের মধ্যে ৬টি, ১৯৬৭ থেকে ১৯৭০ সালের মধ্যে ৩৮টি। এই সময়ে হরতালের স্বাধীনতা বৃদ্ধি পেয়েছিল। ১৯৭১ থেকে ১৯৭৮ সালের মধ্যে ১৯৭টি হরতাল, ১৯৭৫ ও ১৯৭৮ সালের মধ্যে ৪৮টি, ১৯৮৩ থেকে ১৯৮৬ সালের মধ্যে ৫২টি হরতাল, ১৯৮৭ ও ১৯৯০ সালের মধ্যে ২৪৫টি, ১৯৯১ থেকে ১৯৯৪ সালের মধ্যে ২১৬টি এবং ১৯৯৫ ও ২০০২ সালের মধ্যে ১১১০টি হরতাল পালিত হয়েছিল। ২০০৮ সালের নির্বাচনের পরে দেশব্যাপী হরতাল আহ্বান করা হয়েছিল, তবে ২০১৫ সালের মধ্যে হরতাল রাজনীতি কার্যকরভাবে সরকার কর্তৃক গৃহীত শক্তিশালী আইনি ও রাজনৈতিক পদক্ষেপের কারণে বন্ধ হয়েছিল।

এটা সুস্পষ্ট যে ১৯৯১ সালের পর সংসদীয় যুগে হরতালের ফ্রিকোয়েন্সি নাটকীয়ভাবে বৃদ্ধি পেয়েছিল। ১৯৯১ থেকে ১৯৯৪ সাল পর্যন্ত দেশটিতে আওয়ামী লীগের নেতৃত্বে দেশব্যাপী ২১ দিন হরতাল হয়েছিল। ১৯৯৫ থেকে ২০০২ পর্যন্ত মোট ১১১১টি হরতাল আহ্বান করা হয়েছিল। ১৯৯০ সাল থেকে দশ বছরের মেয়াদে প্রায় ৬১১টি দেশব্যাপী হরতাল বিএনপি এবং ৬৭টি আওয়ামী লীগ আহ্বান করেছিল। ইউএনডিপির প্রতিবেদনে বলা হয়েছে,

হরতালের বেশির ভাগ অংশ আওয়ামী লীগ ও বিএনপি আহ্বান জানিয়েছে। ভোক্তা গোষ্ঠী, নাগরিক গোষ্ঠী, ব্যবসায় ও বাণিজ্য সংস্থাগুলো হরতালের ১২ শতাংশের সাথে যুক্ত হয়েছে এবং ছাত্র মোর্চারাও হরতালের একটি বড়ো সংখ্যা ডেকেছে।

যদিও হরতাল বহু আগে থেকেই ব্যবহৃত হয়ে আসছে, তবে এর লক্ষ্যগুলো ১৯৮০ এর দশক পর্যন্ত এককভাবে আরো বেশি জনস্বার্থে থেকে যায়। ১৯৯১ সাল থেকে বাংলাদেশের সংসদীয় যুগে হরতালকে সরকারের প্রতি বিরোধী রাজনৈতিক বিরোধিতার হাতিয়ার হিসাবে ব্যবহার করা হয়েছে (হোসেন, ২০০০)। এমনকি আন্তঃদলীয় গোষ্ঠীদল ও সংঘর্ষের কারণে হরতাল একটি সুস্পষ্ট মাধ্যমে পরিণত হয়েছিল। বেশির ভাগ ক্ষেত্রে হরতালগুলো রাজনৈতিক সহিংসতায় মৃত্যু থেকে উদ্ভূত, যার ফলে আরো হরতাল হয়। প্রকৃতপক্ষে, ২১২টি হরতালে কেবল রাজনৈতিক সহিংসতায় মৃত্যুর খবর পাওয়া গেছে। আন্তঃদলীয় শত্রুতা এবং আন্দোলনমূলক মনোভাব হরতালে সবচেয়ে শক্তিশালী ভূমিকা পালন করেছিল (শেহাবুদ্দিন, ২০০০)।

সংসদীয় বর্জনের ফলে প্রায়শই হরতালের রাজনীতি রাস্তায় হয় যা গণ আন্দোলন, রাস্তায় মিছিল, ব্যাপক জনসাধারণের সহিংসতা ও বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করে এবং প্রাণহানির ঘটনা ঘটায় (আহমেদ ও মুর্তজা, ২০০৫; খুন্দকার, ২০০৫)। বিরোধীদল সমর্থন বেস তৈরি করতে, বৃদ্ধি ও একীকরণ এবং ক্ষমতাসীন দলের পক্ষে ঝামেলা সৃষ্টি করতে হরতালকে সুবিধামতো ব্যবহার করেছিল। হরতাল থেকে সংঘর্ষ ও সহিংসতা হরতাল এবং আরো সহিংসতার দিকে পরিচালিত করে।

চাঁদাবাজি, সন্ত্রাস ও হত্যার মাধ্যমে সহিংসতা

রাজনৈতিক সহিংসতার প্রাথমিক কারণগুলোর মধ্যে চাঁদাবাজি, সামাজিক সন্ত্রাস ও হত্যাকাণ্ড অন্যতম। দলের অনুগত এবং চরমপন্থিদের প্রায়শই তাদের প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে আক্রমণাত্মক হয়ে উঠতে উৎসাহিত করা হয় শারীরিক সংঘর্ষ, চাঁদাবাজি এবং হত্যার মধ্য দিয়ে। এক পক্ষের সমর্থকরা প্রায়শই প্রতিপক্ষ দলগুলোকে অপহরণ করে এবং কখনো কখনো মৃত্যুর জন্য নির্যাতন চালায়। একটি প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, ১৯৯৫ সালে ৫ হাজারেরও বেশি সহিংসতার ঘটনা ঘটেছে এবং ৬,০০,০০০ অপরাধ রেকর্ড করা হয়েছে যার মধ্যে ১,৩০০ হত্যাকাণ্ড, ১,১০০ অপহরণ এবং ২,৯০০ নির্যাতনের ঘটনা রয়েছে। একই বছর, শিক্ষার্থীদের বন্দুক যুদ্ধের ফলে ২৫ জন ছাত্র নিহত হয়েছিল এবং ২৪টি কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ ছিল (হোসেন, ১৯৯ ১৯৯৬)। পাঁচ বছর পরে ২০০০ সালে, পরিস্থিতি আরো খারাপ হয়েছিল। বেশ কয়েকটি

প্রতিবেদন অনুসারে, আওয়ামী লীগ সরকারের আমলে প্রায় প্রচুর হত্যার ঘটনা ঘটেছে এবং ১৯৯৯ সালে কেবল আওয়ামী লীগ-এর দলীয় সংঘর্ষে শতাধিক মানুষ নিহত হয়েছিল। পার্টির সমর্থকরা প্রায়শই প্রতিপক্ষ এবং প্রতিদ্বন্দ্বী দলীয় সমর্থকদের অপহরণ করে এবং বহু ক্ষেত্রে মামলায় নির্যাতন চালিয়ে মৃত্যুদণ্ড দেয়, যা পালটা অপহরণের ঘটনা সৃষ্টি করে। একটি প্রদিবেদন অনুসারে, ২০০৪-২০১৬ এ প্রায় ১৭০০টি অপহরণের ঘটনা রেকর্ড করা হয়েছিল। যদিও অপহরণ-প্ররোচিত চাঁদাবাজি সাধারণত বড়ো পরিমাণে সহিংসতার কারণ হয় না, তবে এটি দলীয় ক্যাডার, সশস্ত্র গুণ্ডা এবং চাঁদাবাজদের মধ্যে ভূগর্ভস্থ রাজনৈতিক উত্তেজনা এবং শত্রুতা বজায় রাখে।

চাঁদাবাজি, সামাজিক সন্ত্রাস, অপহরণ এবং হত্যার ব্যবহার ২০১০-২০২০ সালে আরো ব্যাপক আকার ধারণ করে। রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক লাভ অর্জন, বিরোধিতা থেকে বিরত ও রাজনৈতিক আধিপত্য প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে অসংখ্য রাষ্ট্র-পৃষ্ঠপোষক সশস্ত্র গুণ্ডারা এই উপায় ব্যবহার করে। বাংলাদেশ সমাজে চাঁদাবাজি, সন্ত্রাস ও হত্যাকাণ্ডের মাত্রা সাম্প্রতিক সময়ে গণধর্ষণ এবং বেনাম হত্যার উদ্‌বেগজনক হারের দ্বারা সম্পূর্ণরূপে স্যাচুরেটেড হয়ে উঠেছে।

রাষ্ট্রীয় নির্যাতনের মাধ্যমে সহিংসতা

রাষ্ট্রীয় দমনকে বিরোধী দলগুলো প্রায়শই সরকারের বিরুদ্ধে সহিংস হওয়ার বৈধ কারণ হিসাবে উল্লেখ করে। প্রশাসনিক মেশিনারিগুলোর নিয়ন্ত্রণের কারণে ক্ষমতাসীন দল বিরোধীদের প্রতিরোধ করার জন্য আরো বেশি শক্তির সাথে সাড়া দেয়। ফলে বিরোধী দলগুলো প্রায়শই আইনি এবং পুলিশি দমনপীড়নের শিকার হয়। মানবাধিকার গোষ্ঠীগুলো নিয়মিতভাবে সরকারের বিরুদ্ধে তার রাজনৈতিক বিরোধীদের বিরুদ্ধে গ্রেফতার, হয়রানি এবং মামলা দায়ের করার অভিযোগ তোলে। ১৯৭০ এর দশকের গোড়ার দিকে সরকার কর্তৃক বিশেষ আধা-সামরিকবাহিনীর ব্যাপক ব্যবহার সমাজে ব্যাপক সহিংসতা সৃষ্টি করেছিল। ১৯৯০ সাল থেকে এই প্রবণতা আরো বৃদ্ধি পেয়েছে। বিএনপির এক দাবি অনুসারে, ১৯৯৬-২০০১ সালে আওয়ামী লীগ তাদের প্রচুর নেতাকর্মীকে কারাবন্দি করেছিল। ২০০১-২০০৬ চলাকালীন বিএনপি নেতৃত্বাধীন জোট সরকারের বিরুদ্ধে আওয়ামী লীগও অনুরূপ দাবি করেছিল।

২০০৯ সাল থেকে রাষ্ট্রীয় দমন কৌশলগুলো, বিস্তৃতি, বর্বরতা ও নিষ্ঠুরতার মাত্রা এবং সংকল্পের ক্ষেত্রে পূর্ববর্তী সমস্ত রেকর্ডকে ছাড়িয়ে গেছে। ২০০৮-এর পরবর্তী সরকারগুলো তার দুটি প্রধান লক্ষ্য অর্জনের জন্য অত্যধিক কঠোর হয়ে পড়ে। যদিও 'যুদ্ধাপরাধের' বিচার একটি নির্বাচনি প্রতিশ্রুতি ছিল তা আওয়ামী লীগ সরকার বাস্তবায়ন করেছে।

৫০ বছরের সহিংস রাজনীতি : ব্যাল্যান্স শিট

বাংলাদেশে রাজনৈতিক সহিংসতা পুনরাবৃত্তি এবং এর একটি চক্রীয় ব্যবস্থা রয়েছে। বিরোধী দলকে দুর্বল করার কৌশলগুলোর অংশ হিসাবে দুটি বিরোধী দলের মধ্যে সহিংসতা প্রায়শই ক্ষমতাসীন দলকে দায়ী করা হয়। ফলস্বরূপ, বিরোধী দলগুলো ক্ষমতাসীন দলের বিরুদ্ধে সহিংস হয়ে ওঠে। বিরোধী পদক্ষেপ দমনে ক্ষমতাসীন দল রাষ্ট্রীয় মেশিনারি ব্যবহার করে যা বিরোধী দলকে ক্ষমতাসীন দলের বৃহত্তর দাবির সাথে দাঁড় করিয়ে দেয়। ক্ষমতাসীন দলের পক্ষ থেকে সম্মতি জানাতে বা আপস করতে অনিচ্ছুক বিরোধীদের আরো দৃঢ় এবং হিংস্র করে তোলে। গত দুই দশকে এভাবেই বাংলাদেশে রাজনৈতিক সহিংসতার চক্রবৃদ্ধি বজায় রাখা হয়েছে। এই জাতীয় রাজনৈতিক শৃঙ্খলার বেশ কয়েকটি পরিণতি রয়েছে।

প্রথমত, বাংলাদেশে আন্তঃদলীয় কোন্দল এবং সহিংসতার কারণে দলগুলোর মধ্যে বিদ্যমান শত্রুতা নিয়ে আলোচনা হয়েছে। সহিংসতা আদর্শিক, রাজনৈতিক এবং ধর্মীয়/ধর্মনিরপেক্ষ লাইনের পাশাপাশি রাজনৈতিক বিভেদকে শক্তিশালী করে যা দলগুলোকে অ-মিলনমূলক করে তোলে। ফলস্বরূপ, নীতিগত বিষয়গুলোতে বিতর্ক না করে দলসমূহ নীতিগুলো নিয়ে নিজেকে সহিংসতায় জড়িত বলে মনে করে। এটি কখনো কখনো সরকার এবং বিরোধীদের মধ্যে গুরুতর রাজনৈতিক অচলাবস্থার দিকে পরিচালিত করে।

রাজনৈতিক সহিংসতার দ্বিতীয় পরিণতি হচ্ছে দলগুলোর উপর জনসাধারণের অবিশ্বাস (দত্ত, ২০০৪)। দুই দশকের তীব্র হরতাল রাজনীতি এবং রাজনৈতিক সহিংসতার সংস্কৃতি বিধ্বংসী রাজনৈতিক উত্তরাধিকার থেকে বেরিয়ে আসার প্রধান দলগুলোর সক্ষমতা নিয়ে প্রচুর অবিশ্বাস তৈরি করেছে এবং একটি নতুন রাজনৈতিক বিকল্পের সূচনা করেছে। দলগুলো অস্থিতিশীলতা, সহিংসতা, রাস্তার রাজনীতি এবং জঘন্য হতাশার সমার্থক হয়ে উঠেছে। ব্যবসায়ী মহলসহ নাগরিক সমিতি রাজনৈতিক দলগুলোর ধ্বংসাত্মক কার্যক্রম সম্পর্কে গভীর উদ্‌বেগ প্রকাশ করেছে। ফেডারেশন অব বাংলাদেশ চেম্বার্স অফ কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি (এফবিসিসিআই) দলগুলোকে হরতাল ও রাস্তার রাজনীতি বন্ধের জন্য বারবার অনুরোধ করেছিল, কিন্তু ফলস্বরূপ তা কার্যকর হয়নি। এমনকি এফবিসিসিআই পক্ষগুলোর মধ্যে একটি সংলাপের মধ্যস্থতার প্রস্তাবও দিয়েছিল, তবে এই ধরনের প্রস্তাব দলগুলো প্রত্যাখ্যান করেছে।

শুধু রাজনৈতিক দল নয় দলীয় এলিট ও নেতারাও কঠোর রাজনৈতিক তদন্ত এবং জনসাধারণের অবিশ্বাসের কবলে পড়েছেন। বাংলাদেশে দলীয় এলিট এবং উপ-অভিজাতরা ঐতিহ্যগতভাবে অবিশ্বাস ও বিরোধের একটি শক্তিশালী সংস্কৃতি বজায় রাখে (মোটেন, ১৯৮৫; মুশরাফি, ১৯৯৩)। সহিংস-

রাজনীতির চর্চা কেবল এ জাতীয় সংস্কৃতি আরো গভীর করতে অবদান রেখেছে। শেখ হাসিনা (আওয়ামী লীগ) এবং খালেদা জিয়া (বিএনপি) এই দুই ব্যক্তির রাজনৈতিক নেতৃত্বের প্রায় তিন দশক গুরুতর রাজনৈতিক স্থবিরতা তৈরি করেছে (দত্ত, ২০০৪)। একে অপরের প্রতি তাদের শত্রুতা, ব্যক্তিগত নিষ্ঠার অভাব, সামর্থ্য এবং অ-নেতৃত্বাধীন নেতৃত্বের মনোভাব এই নেতাদের সম্পর্কে সাধারণ মানুষ এবং আগ্রহী গোষ্ঠীগুলোর মধ্যে নাগরিক অবসন্নতা সৃষ্টি করেছে এবং রাজনীতিতে তাদের ধারাবাহিকতা অনেকের দ্বারা ক্রমশ অযাচিত হয়ে উঠছে। দু'জন গুরুত্বপূর্ণ জাতীয় নেতা প্রায় বিশ বছরে কখনো একে অপরের সাথে দেখা করেননি বলে জানা গেছে।

সহিংসতা-রাজনীতির তৃতীয় পরিণতি হলো রাজনৈতিক দাবি প্রকাশের বৈধ উপায় হিসাবে সহিংসতার প্রাতিষ্ঠানিকীকরণ। একটি হিংসাত্মক হরতাল সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করার একটি সস্তা মাধ্যম হয়ে উঠেছে। মূলধারার রাজনৈতিক দলগুলোর ছাত্র এবং ট্রেড ইউনিয়ন সহযোগী সংগঠনগুলো তাদের মূল সংগঠন দ্বারা দাবিগুলো বাস্তবায়ন করতে ক্যাম্পাস এবং শিল্প প্রতিষ্ঠান এবং পাবলিক স্পেসগুলোতে ব্যাপক সহিংসতা ব্যবহার করে। সহিংসতা চরম প্রসঙ্গে একটি চূড়ান্ত প্রকাশের চেয়ে স্বাভাবিক রাজনৈতিক আচরণগত প্যাটার্নে পরিণত হয়েছে।

সহিংস-রাজনীতির চতুর্থ পরিণতি হলো নতুন প্রজন্মের দলের অনুগত, সমর্থক এবং কর্মীদের কাছে বৈধ উপায় হিসাবে সহিংসতার রাজনৈতিক সামাজিকীকরণ। প্রকৃতপক্ষে এটি রাজনৈতিক মিথস্ক্রিয়া এবং নির্বাচনি প্রতিযোগিতায় সহিংসতাকে বৈধ আদর্শ হিসাবে ব্যবহার করছে। যে-কোনো স্তরের নেতৃত্ব সহিংসতার প্রচারের মাধ্যমে উচ্চতর জাতীয় পর্যায়ের দলীয় নেতৃত্বের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। উচ্চ পর্যায়ের নেতৃত্ব এমন নেতাদের পৃষ্ঠপোষকতা করেন যাদের সহিংসতা তৈরি এবং আধিপত্য বজায় রাখার সক্ষমতা রয়েছে। এই জাতীয় নেতাদের দলের উচ্চ পদে পুরস্কার দেওয়া হয়, নির্বাচনি প্রতিযোগিতার জন্য মনোনীত করা হয় বা সরকারি দপ্তরে (সাইকেন্স, ২০১৮) পদে ভূষিত করা হয়। সহিংসতার প্রয়োজনীয়তা সুস্পষ্ট কারণ ক্ষমতায় থাকা রাজনৈতিক দলগুলো সাধারণত রাজনৈতিক ও অন্যান্য সংস্থাগুলোতে নিরঙ্কুশ নিয়ন্ত্রণ দাবি করে। ২০০৯ সাল থেকে বর্তমান সরকারের আমলে আওয়ামী লীগ নেতৃত্বাধীন সরকার জাতীয়, আঞ্চলিক ও স্থানীয় পর্যায়ে অনেক নির্বাচন করেছে। তবে, এই নির্বাচনগুলো নিয়ে নানা অভিযোগ রয়েছে। যেমন : কারাবন্দি এবং বিরোধী প্রার্থী এবং তাদের সমর্থকদের গ্রেফতার, তাদের মনোনয়ন দাখিল করা, সভা করা এবং নির্বাচনি প্রচার চালানো থেকে বিরত রাখা; পোলিং স্টেশনগুলো নিয়ন্ত্রণ করা এবং ভুয়া ভোট দিয়ে ব্যালট বাক্স ভর্তি করা এবং ব্যালট বাক্স ছিনতাই করা (এএইচআরসি, ২০১৩; মনিরুজ্জামান, ২০১৯)। এই নিয়মতান্ত্রিক সহিংসতার উদ্দেশ্য হলো প্রতিপক্ষকে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করা থেকে বিরত রাখা এবং বিনা

প্রতিদ্বন্দ্বিতায় আওয়ামী লীগের প্রার্থীদের বিজয় নিশ্চিত করা। ২০১৪ সালের সাধারণ নির্বাচনে বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচিত সংসদ সদস্যের সংখ্যা ছিল ১৫৪ জন। পরবর্তীতে স্থানীয় পর্যায়ের নির্বাচনে ক্ষমতাসীন দলের প্রার্থীরা তাদের বিরোধীদের বিরুদ্ধে অনুরূপ প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা প্রয়োগ করেছিলেন। ২০১৫ সালে আওয়ামী লীগ সরকার বিএনপি সমর্থিত প্রায় ৫০০ স্থানীয় প্রতিনিধিকে সাময়িক বরখাস্ত করে এবং তাদের স্থলাভিষিক্ত করে আওয়ামী লীগ সমর্থিত কর্মকর্তাদের সাথে। কিন্তু নির্বাচন কমিশন এবং সরকারের পক্ষ থেকে এ ধরনের অভিযোগ অস্বিকার করা হয়েছে।

উপসংহার

বিশ্লেষণে দেখা গেছে যে দলীয় রাজনীতির প্রভাবশালী প্যাটার্ন যে ক্রমবর্ধমানভাবে উত্থিত হয়েছে এবং একটি প্রতিষ্ঠিত আদর্শ হয়ে উঠেছে হিংসা। প্রথমত, বাংলাদেশে আন্তঃদলীয় রাজনৈতিক সহিংসতা কেবল বিস্তৃত ছিল এবং এটি মূলত জাতীয় নীতিগত বিষয়গুলোর সাথে নয়, পারস্পরিক বৈরিতা, ব্যক্তিত্বের দ্বন্দ্ব এবং নেতৃত্বের দ্বন্দ্বের সাথে জড়িত রয়েছে। দ্বিতীয়ত, সহিংসতা ও শত্রুতার মধ্যে একটি চক্রীয় সম্পর্ক রয়েছে যেখানে একজন অন্যকে শক্তিশালী করে। তৃতীয়ত, সংসদ বর্জন, হরতাল, চাঁদাবাজি এবং রাষ্ট্রীয় দমনপীড়নের মাধ্যমে রাজনৈতিক সহিংসতা বহুলাংশে প্রকাশিত হয়েছে। রাজনৈতিক সহিংসতার কারণ ও পরিণতি চক্রাকার এবং রাজনৈতিক অচলাবস্থা তৈরি, দল ও নেতৃত্বের প্রতি জনসাধারণের অবিশ্বাস এবং বিকৃত রাজনৈতিক সামাজিকীকরণের ক্ষেত্রে সহিংসতা-রাজনীতির সংস্কৃতি সহায়ক ভূমিকা পালন করেছে।

সহিংসতাভিত্তিক দলীয় রাজনীতির পেছনের কারণ নির্বাচনি জয় এবং আধিপত্য, যার জন্য দলগুলো সর্বদা আপত্তিহীন এবং যে-কোনো স্তরের সহিংসতার আশ্রয় নিতে প্রস্তুত থাকে। মিল্লামের কথায় (মিল্লাম, ২০০৭: ১৫৫-৫৭) বিজয়ী হওয়াই সবকিছু নয়। রাজনৈতিক জয়ের জন্য অর্থের পরিমাণ খুব বেশি ব্যয় করতে হয় না; কোনো ক্রিয়াকলাপ এটিকে অর্জন করা খুব অনৈতিক বা অবৈধ নয়; এটি বজায় রাখতে কোনো পরিমাণ হিংস্রতা নয়। বহু বছর ধরে, বাংলাদেশের রাজনীতি রক্তাক্ত, কোনো নিয়ম ছাড়াই মারাত্মক হিসাবে সাদৃশ্যপূর্ণ। বিদ্যমান সরকারকে অস্থিতিশীল করার জন্য যা করা হচ্ছে, তা হচ্ছে রাস্তায় বিক্ষোভ ও আন্দোলনের উপর আরো স্বয়ংক্রিয়ভাবে নির্ভরতা; বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসের বৃহত্তর রাজনৈতিকীকরণ; রাস্তার বিক্ষোভে শক্তি প্রয়োগের উপর আরো সচ্ছল নির্ভরতা; নীতির বিষয়ে বিতর্ক এবং আপসকে আরো স্বতঃসংশ্লিষ্ট প্রত্যাখ্যান; এবং দুটি জাতীয় দৃষ্টিভঙ্গির মধ্যে বিস্তৃত বিভাজন (স্বাধীনতা বিরোধী এবং সমর্থক)।

তথ্যসূত্র

Adhikar. 2019. BANGLADESH: Annual Human Rights Reports, (yearly reports between 2007-2019). Dhaka.

Adhikar, 2020a. Bangladesh: Statistics on Political Violence, 2001-2019. Dhaka.

Adhikar, 2020b. Enforced Disappearances (2009 - 2019): State Agencies Responsible, Dhaka.

Ahmed, Iraz and Mortoza, Golam. 2005. 'The Anatomy of Hartal: How to Stage a Hartal," in 'Beyond Hartal: Toward Democratic Dialogue in Bangladesh,' Dhaka : UNDP.

Ahmed, Nizam. 2002. The Parliament of Bangladesh. Aldershot: Ashgate.

Amin, Nurul. 1992. 'Twenty Years of Bangladesh Politics: an overview,' Regional Studies, 10 (2).

Anisuzzaman, M. 2000. 'Identity Question and Politics,' in Rounaq Jahan, (ed.) Bangladesh: Promise and Performance, Dhaka: University Press Limited.

AHRC (Asian Human Rights Commission) 2013. Bangladesh: Lust for Power, Death of Dignity- the State of Human Rights in Bangladesh.

ASK (Ain O Shalish Kendra). 2019. Statistics on Political Violence in Bangladesh, January-May, 2019. Dhaka.

Baxter, Craig. 1982. 'Bangladesh at Ten: An Appraisal of a Decade of Political Development,' World Today, 38 (2): February.

Bertocci, Peter J. 1985. 'The Bangladesh Liberation Movement: Role of Different Parties and Groups,' Dacca University Studies, A(35).

Bhuiyan, Md. Abdul Wadud. 1982. Emergence of Bangladesh and the Role of the Awami League, Stosius: Advent Books Division.

Datta, Sreeradha. 2004. 'Personal Animosity and Parliamentary Politics: Bangladeshi Elections 2001,' Journal of South Asian and Middle Eastern Studies, XXVII (2): 49-70.

Hossain, Akhtar. 2000. 'Anatomy of Hartal Politics in Bangladesh,' Asian Survey, XL (3): 508-29, May/June.

Hoassin, Golam. 1988. General Ziaur Rahman and the BNP: Political Transformation of a Military Regime. Dhaka: UPL.

Hossain, Ishtiaq. 2007. 'Politics 'Minas Two Women': A New Down in Bangladesh?' Opinionasia, 30 July, 2007, available at www.opinionasia.org .

Hossain, Ishtiaq and Mahmud Hasan Khan. 2006. 'The Rift Within An Imagined Community: Understanding Nationalism(s) in Bangladesh,' Asian Journal of Social Science, 34 (2):324-39.

Hosain, Ishiaq and Siddiquee, Noore Alam. 2004. 'Islam in Bangladesh Politics: the role of Ghulam Azam of Jamaat-i-Islami,' Inter-Asia Cultural Studies, 5 (3): 384-99.

Husain, Neila. 2002. 'Armed & Dangerous: Small Arms and Explosives Trafficking in Bangladesh,' South Asia Intelligence Review, 1(13), October 14.

Islam, S. Aminul. 2005. 'The History of Hartal,' in 'Beyond Hartal: Toward Democratic Dialogue in Bangladesh,' Dhaka: UNDP.

Islam, S. Aminul. 2006. 'The Predicament of Democratic Consolidation in Bangladesh,' Bangladesh E-Journal of Sociology, 3 (2), July 2006.

Jackman, David. 2019.Violent Intermediaries and Political Orderin Bangladesh, European Journal of Development Reseasrch, 31:705–723. doi.org/10.1057/s41287-018-0178-8

Kabir, BM Monoar. 1990. 'The Politics of Religion: The Jamaat-i-Islami in Bangladesh,' in Rafiuddin Ahmed (ed.), Religion, Nationalism and Politics in Bangladesh. New Delhi: South Asian Publishers.

Kabir, M. G. 1990. 'Religion, Language and Nationalism in Bangladesh,' in Rafiuddin Ahmed (ed.), Religion, Nationalism and Politic in Bangladesh. New Delhi: South Asian Publishers.

Khan, Zillur Rahman. 1985 'Islam and Bengali Nationalism,' Asian Survey, 25 (8), August.

Khundker, Nasreen. 2005. 'The Price of Hartals : Impact on Economy,' in Beyond Hartal: Toward Democratic Dialogue in Bangladesh, Dhaka: UNDP.

Lifschultz, Lawrence. 1979. Bangladesh: The Unfinished Revolution. London: Zed Press.

Moniruzzaman, Talukder. 1990. 'Bangladesh Politics: Secular and Islamic Trends,' in Rafiuddin Ahmed (ed.), Religion, Nationalism and Politic in Bangladesh. New Delhi: South Asian Publishers.

Milam, William B. 2007. 'Bangladesh and the Burden of History,' Current History (South and Southeast Asia), April: 153-59.

Moniruzzaman, M. 2019. 'Electoral Legitimacy, Preventive Representation, and Regularization of Authoritarian Democracy in Bangladesh,' in Dr. Ryan Merlin Yonk (ed.), Election Studies, UK: Open Access Publishing.

Moniruzzaman, M. 2018. Clientelism, Corruption and Kleptocratic Politics in Bangladesh: A Political Economy Analysis, in Khurshed Alam (ed.), Bangladesh: Economic, Political and Social Issues, NY: Nova Science Publishers.

Moten, Abdul Rashid. 1985. 'The Political Culture of the Party Sub-Elites in Bangladesh,' Asian Thought and Society, 10 (30), November.

Mushrafi, Mokhdum-E-Mulk. 1993. Pakistan and Bangladesh: Political Culture and Parties. New Delhi, South Asia Books.

Pollman, Daniela, 2018. The Anatomy of Violence in Bangladesh, The Armed Conflict Location & Event Data Project (ACLED), https://acleddata.com/2018/11/09/the-anatomy-of-violence-in-bangladesh/

Rahman, Matiur. 2007. 'The Two Ladies Must Step Aside,' (in Bengali), The Daily Prothom Alo, 11 June.

Rahman, Tareque Shamsur. (ed.). 1998. Bangladesh: Rajnitir 25 Bachar (Bangladesh: 25 Years of its Politics), 1st Vol., Dhaka: Mowla Brothers.

Rasheduzzaman, M. 1994. 'The Liberals and the Religious Rights in Bangladesh,' Asian Survey 34 (11): 974-90.

Rasheduzzaman, M. 1997. 'Political Unrest and Democracy in Bangladesh,' Asian Survey, 37(3): 254-68, March.

Sathyamurthy, T.V. 1979. 'Language, Religion and Political Economy: The Case of Bangladesh,' in David Taylor and Malcolm Yapp (eds), Political Identity in South Asia. London, NJ USA: Curzon Press and Humanities Press.

Shehabuddin, Elora. 2000. 'Bangladesh in 1999: Desperately Seeking a Responsible Opposition,' Asian Survey, XL(1): 181-88, January/February.

Suykens, Bert. 2018. 'A Hundred Per Cent Good Man Cannot do Politics' : Violent self-sacrifice, student authority, and party-state integration in Bangladesh,' Modern Asian Studies 52, 3 (2018) pp. 883–916. doi:10.1017/S0026749X16001050

UNDP. 2005. Beyond Hartals : Towards Democratic Dialogue in Bangladesh. Dhaka : UNDP.

Zafarullah, Habib (ed.). 1996. The Zia Episode in Bangladesh Politics. Dhaka: UPL.

Ziring, Lawrence. 1994. Bangladesh: From Mujib to Ershad: An Interpretive Study. Dhaka: UPL.

মো. এনায়েত উল্ল্যা পাটওয়ারী

স্বাধীনতার ৫০ বছর : প্রত্যাশা ও প্রাপ্তি

পঞ্চাশ বছর আগে নয় মাসব্যাপী রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের পর স্বাধীন বাংলাদেশের অভ্যুদয় ঘটে। ১৯৭১ সালের ১৬ ডিসেম্বর আমরা বিজয় লাভ করি। এ বিজয়ের পেছনে রয়েছে অনেক আত্মত্যাগ আর গৌরবগাথার ইতিহাস। এক বিরাট প্রত্যাশা নিয়ে এ জাতি যুদ্ধ করে। যুদ্ধে বিজয়ের মাধ্যমে আমরা লাভ করি বহুল প্রত্যাশিত স্বাধীনতা।

মানুষের শ্রেষ্ঠত্বের অন্যতম বৈশিষ্ট্য হলো তার স্বাধীনতা। তাই স্বাধীন দেশের নাগরিক হিসাবে বসবাস করার উদগ্র বাসনা সকল মানুষের। আমরা বাংলাদেশের জনগণও দীর্ঘকাল পরাধীনতার শিকলে আবদ্ধ ছিলাম। স্বার্থবাদী গোষ্ঠীর ষড়যন্ত্রের কারণে বাংলার স্বাধীন নবাব সিরাজউদ্দৌলার পরাজয়ের মাধ্যমে আমরা ব্রিটিশদের উপনিবেশে পরিণত হই। দীর্ঘ প্রায় দুইশ' বছর পরাজয়ের গ্লানি টেনে অবশেষে কঠিন সংগ্রাম ও আত্মত্যাগের মাধ্যমে ১৯৪৭ সালে ভারত বিভক্তির পর এ অঞ্চলের মানুষ প্রথমবার স্বাধীনতা লাভ করে। মুসলিম জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের ফলশ্রুতিতে ব্রিটিশ ভারত স্বাধীন হয়ে একই সাথে ভারত ও পাকিস্তান নামক দুটি রাষ্ট্রের সৃষ্টি হয়। কিন্তু পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠীর একগুঁয়েমি ও অদূরদর্শিতার কারণে পাকিস্তান রাষ্ট্রের সৃষ্টির পরপরই পাকিস্তানের পূর্বাংশের তথা পূর্ব পাকিস্তানের জনগণ শাসকগোষ্ঠীর বিরুদ্ধে বিক্ষুব্ধ হয়ে ওঠে। রাষ্ট্রভাষা ইস্যুতে পূর্ব পাকিস্তানের জনগণ আন্দোলন সংগ্রাম শুরু করে এবং রক্তাক্ত আন্দোলনের মাধ্যমে রাষ্ট্রভাষা হিসাবে বাংলা ভাষা আদায় করে। এর পর রাজনৈতিক নিপীড়ন, অর্থনৈতিক শোষণ এবং সাংস্কৃতিক আগ্রাসন অব্যাহত থাকে। শাসকগোষ্ঠীর নির্যাতন ও বৈষম্যের বিরুদ্ধে আন্দোলন ও সংগ্রামের মাধ্যমে পূর্ব পাকিস্তানের জনগণ শাসকগোষ্ঠীকে নির্বাচন অনুষ্ঠানে বাধ্য করে। ১৯৭০ সালের সাধারণ নির্বাচনে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বে আওয়ামী লীগ নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করে। কিন্তু ভুট্টো-ইয়াহিয়ার ষড়যন্ত্রের কারণে পূর্ব পাকিস্তানের জনগণ ক্ষমতায় আসীন হতে পারেনি।

তথ্যসূত্র

১. গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক গঠিত পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক জাতীয় কমিটির সাথে পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির চুক্তি, ডিসেম্বর ২, ১৯৯৭।

২. গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান; ঢাকা, ২০০৪।

৩. পার্বত্য জেলা আইন সংকলন, জেলা প্রশাসন, খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলা, নভেম্বর ২০০৫।

৪. সুগত চাকমা, বাংলাদেশের উপজাতি ও আদিবাসীদের সমাজ, সংস্কৃতি ও আচার ব্যবহার, ২য় সংস্করণ, জুলাই ২০০২।

৫. রাঙামাটি বৈচিত্র্যের ঐকতান, জেলা প্রশাসন, রাঙামাটি পার্বত্য জেলা, এপ্রিল ২০০৪।

৬. এম. এ বাশার খান ও এ. আর. হাওলাদার, পার্বত্য শান্তিচুক্তি : সংবিধান স্বাধীনতা সার্বভৌমত্ব, ফেব্রুয়ারি ১৯৯৮।

৭. মেজর জেনারেল (অব.) সৈয়দ মুহাম্মদ ইবরাহিম বীর প্রতীক, পার্বত্য চট্টগ্রাম শান্তি প্রক্রিয়া ও পরিস্থিতির মূল্যায়ন, ফেব্রুয়ারি ২০০১।

৮. গিয়াস কামাল চৌধুরী, আহা পর্বত! আহা চট্টগ্রাম!! অক্টোবর ১৯৯৭।

৯. জাতীয় দৈনিক সমূহে পার্বত্য চট্টগ্রাম সম্পর্কে প্রকাশিত বিভিন্ন কলাম।

১০. Khagrachari 2001-2005, District Administration, Khagrachari Hill District, April 2006.

লেখক পরিচিতি

১. **ড. আলী রীয়াজ**
যুক্তরাষ্ট্রের ইলিনয় স্টেট ইউনিভার্সিটির রাজনীতি ও সরকার বিভাগের ডিস্টিংগুইশড প্রফেসর, আটলান্টিক কাউন্সিলের অনাবাসিক সিনিয়র ফেলো ও আমেরিকান ইনস্টিটিউট অব বাংলাদেশ স্টাডিজের প্রেসিডেন্ট।

২. **ড. মোঃ নজরুল ইসলাম**
অধ্যাপক, পলিটিক্যাল স্টাডিজ বিভাগ
শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়, সিলেট।

৩. **ড. সাঈদ ইফতেখার আহমেদ**
শিক্ষক
আমেরিকান পাবলিক ইউনিভার্সিটি, যুক্তরাষ্ট্র।

৪. **ড. মু. মুনিরুজ্জামান**
সহযোগী অধ্যাপক
রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ
ইন্টারন্যাশনাল ইসলামিক ইউনিভার্সিটি, মালয়েশিয়া

৫. **ড. মো. এনায়েত উল্ল্যা পাটওয়ারী**
অধ্যাপক, রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ
চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়

৬. **ড. মইনুল ইসলাম**
অধ্যাপক (অব.) অর্থনীতি বিভাগ
চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়

৭. **কাজী সাহাবউদ্দিন**
সাবেক মহাপরিচালক
উন্নয়ন গবেষণা পরিষদ (বিআইডিএস)

ড. তারেক শামসুর রেহমান বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের সাবেক সদস্য। তিনি জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিভাগের অধ্যাপক ও বিভাগের সাবেক চেয়ারম্যান। অধ্যাপক রেহমান গত দু'দশক ধরে আন্তর্জাতিক রাজনীতি, আন্তঃরাষ্ট্রীয় সম্পর্ক ও বৈদেশিক নীতি নিয়ে গবেষণা করছেন। এর ফলশ্রুতিতে তিনি এসব বিষয়ে বেশ কটি গ্রন্থও প্রকাশ করেছেন। আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিষয়ে পিএইচডি ডিগ্রির অধিকারী ড. রেহমান ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে অনার্স ও মাস্টার্স ডিগ্রি সম্পন্ন এবং জার্মানি থেকে আন্তর্জাতিক সম্পর্কে পিএইচডি ডিগ্রি অর্জন করেছেন। তুলনামূলক রাজনীতি নিয়ে তাঁর বেশ কটি গ্রন্থ রয়েছে। ড. রেহমান একজন সুপরিচিত কলাম লেখক। প্রায় প্রতিটি জাতীয় দৈনিকে তাঁর কলাম নিয়মিত ছাপা হয়।

তাঁর উল্লেখযোগ্য গ্রন্থগুলোর মধ্যে রয়েছে ইরাক যুদ্ধ পরবর্তী আন্তর্জাতিক রাজনীতি, ইরান সংকট ও উপসাগরীয় রাজনীতি, চীন বিপ্লবের ৭০ বছর, ভারত মহাসাগর ভারত চীন দ্বন্দ্ব, বিশ্বরাজনীতির ১০০ বছর, বিশ্বরাজনীতির ১০০ বছর (দ্বিতীয় খণ্ড), আন্তর্জাতিক রাজনীতিকোষ, মধ্যপ্রাচ্যের রাজনীতি, বাংলাদেশের পররাষ্ট্রনীতি, দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার রাজনীতি, গণতন্ত্রের শত্রু মিত্র, নয়া বিশ্বব্যবস্থা ও সমকালীন আন্তর্জাতিক রাজনীতি, বিশ্বরাজনীতির চালচিত্র, উপআঞ্চলিক জোট, ট্রানজিট ইস্যু ও গ্যাস রফতানি প্রসঙ্গ, বাংলাদেশ রাষ্ট্র ও রাজনীতি, বাংলাদেশ : রাজনীতির ২৫ বছর, বাংলাদেশ রাজনীতির চার দশক, গঙ্গার পানি চুক্তি : প্রেক্ষিত ও সম্ভাবনা, সোভিয়েত-বাংলাদেশ সম্পর্ক ইত্যাদি।

ড. রেহমান তাঁর গবেষণার কাজে পৃথিবীর অনেক দেশ সফর করেছেন। তিনি যুক্তরাষ্ট্রের স্টেট ডিপার্টমেন্টের আইভিপি ফেলো।